

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম



শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান



সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মূল

শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান

অনুবাদ

মো. আবদুল আউয়াল হেলাল



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

সীরাতে হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
মূল : শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান
অনুবাদ : মো. আবদুল আউয়াল হেলাল
[ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১০৪
ইফা প্রকাশনা : ২৮৬৮
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৬৩
ISBN : 978-984-06-1647-2

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০১৮
অগ্রহায়ণ ১৪২৫
রবিউল আউয়াল ১৪৪০

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
ড. সৈয়দ শাহ্ এমরান

প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১১৯১

প্রচ্ছদ : প্রিন্টওয়ান

মুদ্রণ ও বাঁধাই
বোরহান উদ্দিন মোঃ আবু আহসান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৮৮.০০ (আটাশি) টাকা মাত্র

SIRATE HABIBE KHODA [Life Sketch of Hazrat Muhammad (SM)] : Written by Shaikhul Hadith Allama Muhammad Hobibur Rahman in Arabic, translated by Muhammad Abdul Awal Helal and published by Dr. Syed Shah Amran, Project Director, Islamic Books Publication Project-2nd Phase, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181191. November 2018

E-mail : ifapublicationproject@gmail.com
Website : www.islamicfoundation.gov.bd

Price : Tk. 88.00; US Dollar : 5.00

মহাপরিচালকের কথা

আসমান-যমীন, গ্রহ-তারা, পশু-পাখি, নদী-নালা সবকিছু যাঁর উসিলায় সৃষ্টি তিনি হলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন দয়ালু নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি রাসূল হিসেবে সর্বশেষ প্রেরিত হলেও তাঁর নূরের সৃষ্টি সৃষ্টির সর্বাগ্রে। মানব জাতির হিদায়াতের জন্য মহান আল্লাহ বহু নবী পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

পূর্ববর্তী অনেক নবী তাঁর উম্মত হিসেবে পৃথিবীতে আসার আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন। তিনি মানবতার নবী, দয়ালু নবী। তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো, মানবজাতিকে সৎকাজের পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়ে সেদিকে উৎসাহিত করা আর অসৎকাজের কুফল তুলে ধরে তা থেকে ভীতি প্রদর্শন করা ও মন্দকাজে নিরুৎসাহিত করা। আল-কুরআনে এসেছে, "আমিতো আপনাকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি" (২৫:৫৬)। সাথে সাথে তাঁর আনিত বিধানাবলি বাস্তবে রূপায়িত করা উম্মতের উপর ফরয। যেমন ইরাশাদ হচ্ছে, "রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা আঁকড়ে ধর এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক" (৫৯:৭)। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পুরো জীবনধারাটি উম্মতের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। কাজেই তাঁর জীবনী সম্পর্কে যত বেশি অবগত হওয়া যাবে তত বেশি তাঁকে অনুসরণ ও অনুকরণ করা সম্ভবপর হবে। সীরাতে ইব্ন হিশামসহ অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হলেও আলোচ্য পুস্তকটি বিভিন্ন দিক থেকে ব্যতিক্রম ও গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে অনেক বিরল বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যা অন্যান্য গ্রন্থসমূহে অনুপস্থিত। সঠিক বিবেচনায় গ্রন্থটি প্রকাশের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। গ্রন্থটি পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত বলে আমার বিশ্বাস।

মহান আল্লাহ গ্রন্থটি উত্তমরূপে কবূল করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হাবীব। তিনি সৃষ্টিকুলের সর্দার এমনকি সাইয়িদুল মুরসালীন বা শ্রেষ্ঠ রাসূল। তিনি এমনি এক যুগ সন্ধিক্ষণে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন যখন আরবদেশসহ গোটা বিশ্ব জাহিলিয়াতের ঘোর অমানিশায় হাবুডুবু খাচ্ছিল, মানুষ খুঁজে পাচ্ছিল না পথের দিশা, চারদিকে শিরক ও কুফরের জয়জয়কার। "জোর যার মুল্লুক তার" এ নীতি সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত। এমনি এক প্রেক্ষাপটে মহান আল্লাহ্ আকণ্ঠ নিমজ্জিত এ জাতিকে হেদায়াতের জ্যোতির্ময় পথের দিকে টেনে তোলার জন্য প্রেরণ করলেন হাবীবে খোদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে। তিনি তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টার পর জাতিকে দেখালেন আলোর দিশা, বর্বর আরব জাতিকে পরিণত করলেন সোনার মানুষে। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই বলেছেন, "সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, তারপর পরের যুগ, অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ"—এ তিনটি যুগকে ইতিহাসের সোনালী যুগ বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ২৩ বছরের নবুয়তী জীবনে বর্বর ও অসভ্য মানুষকে অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত করতে পেরেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "সাহাবীগণ নক্ষত্রপুঞ্জ তুল্য, তুমি যাকেই অনুসরণ করবে, সুপথ প্রাপ্ত হবে।" যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণ করেছিল তাঁরা সুপথ প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং যুগে যুগে সে আদর্শের অনুকরণই মানুষকে সুপথপ্রাপ্ত করে যাবে। তিনিই উম্মতের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ। তাঁর জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে উম্মতের জন্য মহান শিক্ষা।

গ্রন্থকার শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান তাঁর 'হাদিয়াতুল লাবীব ফী নাবযাতিম মিন সীরাতিন নাবিয়্যিল হাবীব' গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের অতিগুরুত্বপূর্ণ খুঁটিনাটি বিষয় অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থটি অনুবাদের দায়িত্ব পালন করেছেন মো. আব্দুল আউয়াল হেলাল। তিনি প্রাঞ্জল ভায়ায় গ্রন্থটির অনুবাদ করার প্রয়াস পেয়েছেন। লেখকের বর্ণনা মতে, তিনি আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থটির ভাবানুবাদ করেছেন। গ্রন্থটি সাধারণ বাংলাভাষী পাঠককে অনেক বিরল বিষয়ে অবগত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

মাহান আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে পরকালের নাজাতের উসীলা হিসেবে কবূল করুন। আমীন!

ড. সৈয়দ শাহ্ এমরান
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা

ভূমিকা

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين وبعد

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, সত্তাগত এবং গুণগত দিক থেকে যার কোন শরীক নেই। দরূদ ও সালাম সেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যিনি কুল মাখলুকাতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ রচনার সাথে নিজের নামটি জড়িত করার নেক ইরাদা আমার দীর্ঘ দিনের। আরবী ভাষাজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নিয়েও এ মহৎ কাজটির সাথে নিজেকে জড়ানোর লোভ সামলাতে পারলাম না।

উসতাযুল উলামা, শায়খুল হাদীস আল্লামা মো. হবিবুর রহমান ছাহেব হাফিযাহুল্লাহ্'র রচিত গুরুত্বপূর্ণ সীরাত গ্রন্থ 'হাদিয়্যাতুল লাবীব ফী নাবযাতিম মিন সীরাতিন নাবিয়্যিল হাবীব' যা আরবী ভাষায় লিখিত। এতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের খুঁটিনাটি বহু বিষয় স্থান পেয়েছে। মহান আল্লাহর তাওফীক কামনা করে ২০১১ সালে বৃটেনে বসে এটি অনুবাদের কাজে হাত দিই এবং আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে তা সফলতার সাথে সমাপ্ত করি। বইটি অনুবাদের ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদের পেছনে না থেকে ভাবানুবাদের প্রতি জোর দিয়েছি।

সম্প্রতি বৃটেন সফরে এসেছিলেন বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব কাসীদায়ে বানাত সুআদ, কাসীদায়ে বুরদা, কাসীদাতুন নু'মান ও কাসীদায়ে গাউসিয়া'র মতো উচ্চাঙ্গের আরবী কাসীদা, কাসীদায়ে শাহ নিয়ামত উল্লাহ ও নালায়ে কলন্দর-এর মত ভাবগম্ভীর ফার্সী এবং উর্দু কাব্যগ্রন্থের সফল কাব্যানুবাদক মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান। প্রাজ্ঞ এ আলিমে দীন অনুবাদকর্মটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিয়েছেন। আমি তাঁর প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

মদীনা শরীফের প্রখ্যাত বুযুর্গ আল্লামা সায়্যিদ আল-হাবীব আসিম আদী মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া দামাত বারাকাতুহ্ মূল গ্রন্থটি সম্পর্কে

বলেন, "প্রতিটি কথা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয় কথকের গুরুত্বের উপর। প্রতিটি আলোচনা মর্যাদা পায় আলোচকের মর্যাদার কারণে। তাই তো হাদীসে পাকের এতো মর্যাদা। কেননা এর সম্পর্ক সায়্যিদুল ওয়ারা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে। আমি মনে করি, সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও এ কিতাবখানা পাঠকগণকে ব্যাপকভাবে উপকৃত করবে।"

উল্লেখ্য যে, গ্রন্থকারের নির্দেশনাক্রমে মূল বইয়ের বিভিন্ন স্থানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজন করা হয়েছে, যা মূল কিতাব এবং অনুবাদের পূর্ববর্তী সংস্করণে ছিল না। আশা করি এই সংযোজন কতিপয় বিষয়ে পাঠকের সংশয় নিরসনে সহায়ক হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশধারা

সায়্যিদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইব্‌ন **আবদুল্লাহ** ইব্‌ন **আবদুল মুত্তালিব** (তাঁর আসল নাম শাইবাতুল হামদ) ইব্‌ন **হাশিম** (তাঁর আসল নাম হাকীম) ইব্‌ন **আবদে মানাফ** (তাঁর আসল নাম মুগীরাহ) ইব্‌ন **কুসাই** (তাঁর আসল নাম মুজাম্মি‘) ইব্‌ন **কিলাব** (তাঁর আসল নাম হাকীম) ইব্‌ন **মুররাহ** ইব্‌ন **কা‘ব** ইব্‌ন **লুআই** ইব্‌ন **গালিব** ইব্‌ন **ফিহ্‌র** (তাঁর অপর নাম কুরাইশ) ইব্‌ন **মালিক** ইব্‌ন **নাদ্‌র** ইব্‌ন **কিনানাহ** ইব্‌ন **খুযায়মাহ** ইব্‌ন **মুদরিকাহ** ইব্‌ন **ইলইয়াছ** ইব্‌ন **মুদার** ইব্‌ন **নিযার** ইব্‌ন **মাআদ্দ** ইব্‌ন **আদনান** (সহীহ বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার, বাবু মাবআসিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৫৭)।

ফায়দা- ১

এই বংশধারায় আদনান পর্যন্ত নামের তালিকা বিশুদ্ধ বলে উলামায়ে কিরাম ঐকমত্য পোষণ করেন। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় *আল জামিউস সাহীহ* কিতাবে (বুখারী শরীফ) *মাবআসুন নাবিয়্যি* সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিচ্ছেদে বংশধারা *আদনান* পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। আদনানের পর হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ইব্‌ন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত এবং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম থেকে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম, তারপর হযরত নূহ আলাইহিস সালাম থেকে হযরত আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত নাম এবং সংখ্যা নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।

মায়ের দিক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশ হচ্ছে- **মুহাম্মদ** ইব্‌ন **আমিনা** (ওফাত ৫৭৬ ঈসায়ি) বিনতে **ওয়াহাব** ইব্‌ন **আবদে মানাফ** ইব্‌ন **যুহরাহ** ইব্‌ন **কিলাব** (ইব্‌ন সা‘দ, আততাবাকাতুল কুবরা, ১খ., পৃ. ৩১)। কিলাব হচ্ছেন তাঁর ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ। কিলাব থেকে শুরু করে নবীজির মাতৃ এবং পিতৃ বংশলতিকা একই।

ফায়দা- ২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতৃগর্ভে থাকাকালীন তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ (৫৪৫-৫৭০ ঈসায়ি) মদীনা শরীফে স্বীয় পিতা আবদুল মুত্তালিব (ওফাত ৫৭৮ ঈসায়ি) এর মামার গোত্র বনী নাজ্জারের কাছে অবস্থানরত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মা আমিনা স্বামী আবদুল্লাহর কবর যিয়ারত এবং বনী নাজ্জারে আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের পর মক্কা শরীফে ফেরার পথে *আল-আবওয়া* নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। এ সময় শিশু নবীকে রক্ষণাবেক্ষণকারী উম্মে আয়মান তাঁকে তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের কাছে পৌঁছে দেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ১৬৩)।

ফায়দা- ৩

উলামায়ে কিরামের কাছে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাতা-পিতা নাজাতপ্রাপ্ত। আবদুল্লাহ থেকে আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিতৃপুরুষ সবাই *মুওয়াহহিদ* বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। বিষয়টি মুতাকাদ্দিমীন এবং মুতাআখখিরীন অনেকেই স্ব-স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া অনেক বিশেষজ্ঞ উলামা এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাবও লিখেছেন।

ফায়দা- ৪

মিরকাতুল মাফাতীহ রচয়িতা ইমাম নূরুদ্দীন আলী ইবনে সুলতান মুহাম্মাদ হারাবী মোল্লা আলী কারী (ওফাত ১০১৪ হিজরি) রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি রিসালায় পাওয়া যায় যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিতা-মাতা কুফ্‌র এর উপর ইন্তিকাল করেছেন। কিন্তু এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, ইমাম মোল্লা আলী কারী তাঁর এ মত পরিত্যাগ করে এ বিষয়ে জমহুর বা অধিকাংশ উলামার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইমাম কাযী আয়ায রচিত কিতাব *আশশিফা* এর শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থে ইমাম আলী কারী দুই স্থানে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রথম হলো *শরহে শিফা* কিতাবের প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায় *যিক্‌রু ফীহি মিন মু'জিযাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাফজীরুল মা-য়ি বিবারাকাতিহি* শীর্ষক পরিচ্ছেদে তিনি বলেছেন-

و أما إسلام أبويه ففيه أقوال ، والأصح إسلامهما كما اتفق عليه اجلة الاعلام من الامة

"তাঁর পিতা-মাতার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অনেক কথা রয়েছে। তবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো, তাঁরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যেরূপ উম্মাহ্‌র বিশেষজ্ঞ উলামাগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন" (শারহুশ শিফা, ইমাম মোল্লা আলী কারী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬০৫)।

দ্বিতীয় হলো, উল্লিখিত কিতাবের একই খণ্ডের একই অধ্যায়ে *ইহ্‌য়ায়ে মাওতা* বা মৃতকে জীবিতকরণ শীর্ষক পরিচ্ছেদে তিনি বলেন-

و أما ما ذكروا من إحياءه صلى الله عليه و آله وسلم أبويه وإسلامهما فالأصح انه وقع على ما عليه الجمهور الثقات

"বিশ্বস্ত অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিতা-মাতাকে জীবিত করা হয়েছিল এবং তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন" (শারহুশ শিফা, ইমাম মোল্লা আলী কারী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৫১)।

ফায়দা- ৫

অনুরূপভাবে হযরত আবদুল্লাহ এবং আমিনা কুফরের উপর ইন্তিকাল করেছেন মর্মে ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির *ফিকহে আকবার* কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন যুগের গবেষকগণের গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, এধরনের কথা ফিকহে আকবারে তাহরীফ বা ইচ্ছাকৃত রদবদলের কারণেই এসেছে। এসব বানোয়াট কথার সাথে ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কিতাবে বিষয়টি নেই। পরবর্তীতে এ কথা জুড়ে দেয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেন, এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে তারিখ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন- রবিউল আউয়ালের দ্বিতীয় রজনীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, আবার কেউ বলেছেন দশ তারিখে। মিসরের প্রখ্যাত গবেষক আলিম ও জ্যোতির্বিদ মাহমূদ পাশা *আমুল ফীল* বা হস্তিবছরের রবিউল আউয়াল মাসের নয় তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন মর্মে মত দিয়েছেন। মুহাদ্দিসীনের কাছে গ্রহণযোগ্য মত হলো, আট রবিউল আউয়াল তাঁর শুভ জন্ম হয়েছে। জমহুর উলামা ও উম্মতের অধিকাংশের কাছে বিখ্যাত মত হচ্ছে, রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখ সুবহে সাদিকের সময় মক্কা শরীফে আবু তালিবের গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ফায়দা- ৬

ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১১৭৬ হিজরি) স্বীয় কিতাব *ফুয়ূদুল হারামাইন* এ নবীজির জন্মস্থান সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, এই সেই ঘর যে ঘরে প্রতি বছর মীলাদুন্নবীর রাতে মক্কাবাসীগণ সমবেত হন এবং বারাকাত লাভের আশায় রাতভর সেখানে যিকির-আযকার ও দোয়া করে থাকেন। শাহ ছাহেব হারামাইনে অবস্থানকালে সেসব মুবারক অনুষ্ঠানে নিজে অংশ নিয়েছেন। অনুরূপভাবে শাহ আবদুল গনী মুহাদ্দিস দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হিন্দুস্তান থেকে হিজরত করে হারামাইনে চলে যাবার পর সেসব গুরুত্বপূর্ণ মাহফিলে অংশ নিতেন।

ফায়দা- ৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জন্মের স্মৃতি বিজড়িত সেই মুবারক গৃহ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জনের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে আসছে। এক

সময় এ গৃহ হযরত আকীল ইব্‌ন আবু তালিব বিক্রি করেন। কালক্রমে এ ঘর হাজ্জাজের ভাই মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ সাকাফীর কাছে হস্তান্তরিত হয়। খলীফা হারূনুর রশীদের মা খায়যুরান যে সময় হজ্জ করেন তখন তিনি এই ঘরকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। অন্যমতে হারূনুর রশীদের পত্নী যুবাইদা হজ্জ পালনকালে এ ঘরকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। বর্তমানে এ ঘরটি মাকতাবাহ বা লাইব্রেরিরূপে বিদ্যমান আছে।

মসজিদে হারাম থেকে পূর্বদিকে বাবুস সালাম দিয়ে বের হলে কিছু দূরে অনুচ্চ টিলার উপর সেই ঘর রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের রাতে সংঘটিত কতিপয় অলৌকিক ঘটনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভ জন্মের রাতে কিসরার (নওশেরওয়া) রাজপ্রাসাদ প্রচণ্ডরূপে কেঁপে উঠে। আর এ কম্পনের ফলে প্রাসাদের ১৪টি গম্বুজ ধ্বসে পড়ে। এক হাজার বছর থেকে প্রজ্জ্বলিত পারস্যের অগ্নিকুণ্ড এক পলকে নিভে যায়। সাওয়া হ্রদ এমনভাবে শুকিয়ে যায় যেনো এতে কোনো দিন পানিই ছিলো না। উপরোল্লিখিত অলৌকিক ঘটনাগুলো হাফিয ইবনে সায়্যিদুন নাস (৬৭১-৭৩৪ হিজরি) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজ কিতাব *উয়ূনুল আছার* এ উল্লেখ করেছেন। দীর্ঘ সনদসূত্রে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, মাখযূম ইবনে হানী স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভ জন্মের রাতে কিসরার রাজ প্রাসাদ কেঁপে উঠে। এভাবে তিনি পুরো ঘটনার দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন।

একই সনদসূত্রে ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী *আল ইসাবাহ* কিতাবে এবং ইবনুস সাকান ইয়া'লা ইব্‌ন ইমরান বাজারী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মাখযূম ইব্‌ন হানী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভ জন্মের রাতে কিসরার রাজপ্রাসাদ কেঁপে উঠে এবং ১৪টি গম্বুজ ধ্বসে পড়ে। সাওয়া হ্রদ শুকিয়ে যায় (সীরাতুল মুস্তাফা, ১ম খ., পৃ. ৬৩)।

ইমাম ইবনে কাছীর *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে এ ঘটনাগুলো এভাবেই উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত প্রামাণ্য গ্রন্থগুলোর বরাতে এসব ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইদরীস কান্দালাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় *সীরাতুল মুস্তাফা* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে। সেই রাতের অলৌকিক ঘটনাগুলোর মধ্যে রয়েছে, যে

ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম হয়েছে সে ঘরখানা নূরে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ফেরেশতাগণ নিকটবর্তী হয়ে যান। এসব বিষয় অবলোকন করেছেন হযরত আমিনা এবং তাঁর পরিচর্যায় নিয়োজিত মহিলাগণ। তাঁরাই এসব বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুবারক নামসমূহ

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত জুবায়ির ইব্ন মুতইম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার পাঁচটি নাম রয়েছে। আমি *মুহাম্মাদ* এবং *আহমাদ*। আমার এক নাম *মাহী*, যার মাধ্যমে আল্লাহপাক কুফরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। আমার এক নাম *হাশির*। যেহেতু আমার পায়ের কাছে কিয়ামতের দিন লোকেরা সমবেত হবে। আমার আরেক নাম *'আকিব*।

এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহপাক তাঁর অন্যান্য নামসমূহ জানানোর পূর্বে তিনি এরূপ বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কুরআনে আমার নাম *মুহাম্মাদ*। ইন্জীলে আমার নাম *আহমাদ*। আর তাওরাতে আমার নাম *আহীদ* বা রক্ষাকারী। কেননা আমি আমার উম্মতকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী হবো।

ফায়দা- ৮

বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর *মুহাম্মাদ* নামকরণের কারণ সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর নাম *মুহাম্মাদ* (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, তাঁকে গর্ভে ধারণকালে তাঁর মা অনেক শুভ স্বপ্ন দেখেছেন। এর মধ্যে একটি হলো- তিনি দেখলেন, একজন আগন্তুক এসে তাঁকে বলছেন, হে আমিনা! আপনি দু'জাহানের সরদার এবং সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে গর্ভে ধারণ করেছেন। সুতরাং জন্মের পর তাঁর নাম রাখবেন *মুহাম্মাদ* (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। এ বর্ণনাটি ইমাম ইবনে সায়্যিদিন নাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় *উয়ূনুল আছার* কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম সুয়ূতী *খাসাইসুল কুবরা* কিতাবে বলেছেন, একইভাবে *মুহাম্মাদ* এবং *আহমাদ* নাম রাখা হয়েছে। নাম রাখার বিষয়টি একইভাবে মসজিদে নববীর খতীব ও মদীনা শরীফের শাফিঈ মাযহাবের মুফতী আল্লামা সায়্যিদ

জা'ফার ইব্‌ন হুসাইন বারযিনজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় *ইকদুল জাওহার ফী মাওলিদিন নাবিয়্যিল আযহার* (বরযিনজী শরীফ) কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

ফায়দা- ৯

মুতাকাদ্দিমীন এবং মুতাআখখিরীনের মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেশিরভাগ নামই গুণবাচক। ইমাম হাফিয ইবনে আসাকির দিমাশ্‌কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় বিখ্যাত কিতাব *তারীখ দিমাশ্‌ক* এ একটি পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন *বাবু আসমাইন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি* ওয়াসাল্লাম।

একইভাবে ইমাম আবু বাক্‌র ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি *আরিদাতুল আহওয়াযী শারহু সুনানে তিরমিযী*, ইমাম সাখাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি *আল কাওলুল বাদী*'তে ও ইমাম কাযী আয়ায *আশ শিফা* কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও অন্যান্যরা নিজ নিজ কিতাবে এ বিষয়ে পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন।

ফায়দা- ১০

ইমাম কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর *আসমাউল হুসনা* থেকে ত্রিশটি নাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য নির্ধারিত করেছেন। ইমাম কাসতাল্লানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহপাক তাঁর সত্তরটি নাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য নির্ধারিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম মুবারকের সংখ্যা সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের অনেক উক্তি পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন, নাম মুবারকের সংখ্যা চারশত। আবার কেউ বলেছেন, এক হাজার। যেমন শায়খুল ইসলাম ডক্টর মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী স্বীয় কিতাব *আসমাউন নাবিয়্যি* সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম মুবারকের সংখ্যা এক হাজার উল্লেখ করেছেন। ইমাম জাযুলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি *দালায়িলুল খায়রাত* এ দুইশত এক নাম উল্লেখ করেছেন।

ফায়দা- ১১

অনেক বিশেষজ্ঞ আলিম নবীজির নাম মুবারকের বিষয় নিয়ে স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। যেমন ইমাম ইউসুফ ইব্‌ন ইসমাঈল নাবহানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি -এর এ বিষয়ে দুটি কিতাব রয়েছে। প্রথমটি গদ্যে *আল আসমা ফীমা লিসায়্যিদিন নাসি মিনাল আসমা*। দ্বিতীয়টি পদ্যে *আহসানুল ওয়াসায়িল ফী নাযমি আসমাইন নাবিয়্যিল কামিল*। শায়খুল ইসলাম ডক্টর মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী উর্দু ভাষায় নাম মুবারক বিষয়ে কিতাব লিখেছেন। কেউ ইচ্ছা করলে বিস্তারিত জানার জন্য সেই কিতাবগুলো দেখতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খতনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খতনার ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়।

প্রথমত : তিনি খতনাকৃত এবং নাভি রজ্জু কর্তিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়ত : তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব জন্মের সপ্তম দিবসে খতনা করিয়েছেন।

তৃতীয়ত : হালিমা সা'দিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে অবস্থানকালে বক্ষ বিদারণকালে ফিরিশতাগণ কর্তৃক খতনা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুগ্ধ পানকারিণীগণ

প্রথমে তাঁকে দুধ পান করিয়েছেন তাঁর মা আমিনা যুহরিয়্যা। এরপর কয়েক দিন দুধপান করিয়েছেন সুওয়ায়বা। তিনি ছিলেন সেই সৌভাগ্যবতী দাসী মহিলা, নবীজির জন্মের সুসংবাদ প্রদানের কারণে যাকে আবু লাহাব দাসত্ব মুক্ত করে দিয়েছিল। এরপর দুধপান করিয়েছেন হালিমা সা'দিয়া বিনতে আবু যুওয়াইব। সঠিক বর্ণনামতে, বনি সা'দ গোত্রে হালিমার গৃহে তিনি চার বছর অবস্থান করেন। বক্ষ বিদারণের ঘটনার পর হালিমা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো পাঁচ বছর।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লালন-পালনকারিণীগণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে সকল মহিলা লালন-পালন করেছেন তাঁরা হলেনঃ তাঁর মা আমিনা, সুওয়ায়বাহ (আবু লাহাবের দাসী), হালিমা সা'দিয়া এবং তাঁর মেয়ে সায়মা ও উম্মে আয়মান বারাকাহ।

ফায়দা- ১২

ইতিহাসের কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, উপরোল্লিখিত মহিলাগণ ছাড়াও আরো কতিপয় মহিলা তাঁকে লালন-পালন করেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেনঃ খাওলাহ বিনতে মুনযির, হালিমা ছাড়া বনী সা'দ গোত্রের অপর একজন মহিলা, এছাড়া আরো তিনজন মহিলা, যাদের প্রত্যেকের নাম ছিলো আতিকাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্ষ বিদারণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্ষ বিদারণের ঘটনা চারবার সংঘটিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং

অন্যান্য ইমামগণ হযরত উত্‌বা ইব্‌ন আবদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে এবং ইমাম সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি *খাসাইসুল কুবরা* কিতাবে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সূত্রে একথা বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি *ফাত্‌হুল বারী* কিতাবে এবং ইমাম যুরকানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি *শারহু মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যাহ* কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, প্রথমবার বক্ষবিদারণ সংঘটিত হয়েছে হালিমা সা'দিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে অবস্থানকালে। তখন তাঁর বয়স ছিলো চার বছর।

ইমাম ইবনু হিব্বান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম আবূ নাঈম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি *সাহীহ ইবনু হিব্বান* এবং *দালাইলুন নুবুওওয়াহ* কিতাবদ্বয়ে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, দ্বিতীয়বার বক্ষবিদারণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যখন তাঁর বয়স ছিলো দশ বছর।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি *ফাতহুল বারী* কিতাবে, ইমাম আবু দাউদ তায়য়ালিসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় মুসনাদে হযরত আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তৃতীয়বার বক্ষবিদারণের ঘটনা ঘটে নবুওয়াতের দায়িত্ব প্রাপ্তির প্রাক্কালে। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম নাসাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখের বর্ণনামতে চতুর্থবার বক্ষ বিদারণ হয়েছে মি'রাজের রাতে (সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, ১ম খ., পৃ. ৫৬; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২খ., পৃ. ২৭৫; যুরকানী, ১খ., পৃ. ১৮৩)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুণ্যাত্মা সহধর্মিণীগণ

১. হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহা

বিয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স ছিলো পঁচিশ বছর আর খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স ছিলো চল্লিশ বছর। তিনি ওহী নাযিলের পূর্বে পনেরো বছর এবং ওহী নাযিলের পর হিজরত-পূর্ববর্তী তিন বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পত্নী হিসেবে জীবিত ছিলেন।

২. হযরত সাওদা বিনতে যামআ রাদিয়াল্লাহু আনহা

হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তিকালের তিন বছর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হযরত সাওদার শাদী হয়। ৫৫ হিজরি সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৩. হযরত আইশা বিনতে আবূ বাক্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহুমা

হিজরতের দুই বা তিন বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হযরত আইশার বিয়ে হয়। তখন তিনি ছয় অথবা সাত বছরের বালিকা ছিলেন। হিজরতের পর তাঁর বাসররাত অনুষ্ঠিত হয়। তখন তাঁর বয়স ছিলো নয় বছর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স ছিলো মাত্র আঠারো বছর। একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কোনো কুমারী কন্যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাদী করেননি। ৫৮ হিজরি সালে হযরত আইশা ইন্তিকাল করেন।

৪. হযরত হাফসা বিনতে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা

দ্বিতীয় হিজরিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। ৫৪ হিজরি সালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৫. উম্মে হাবীবা রামলা বিনতে আবূ সুফ্‌য়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা

হযরত উম্মে হাবীবা তাঁর স্বামীর সাথে হাবশায় (আবিসিনিয়ায়) হিজরত করেন। সেখানে গিয়ে তাঁর স্বামী ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। হাবশায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তাঁর শাদী হয়। হাবশার বাদশাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষে তাঁর মোহর পরিশোধ করেন। পরিমাণ ছিলো চার হাজার দীনার। আর হযরত উসমান ইব্‌ন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজির পক্ষে এ বিয়েতে দায়িত্বশীল ছিলেন। ৪৪ হিজরিতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৬. উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে উমায়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা

দ্বিতীয় হিজরিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি ৬২ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। এক বর্ণনামতে উম্মুল মুমিনীনগণের মধ্যে তিনি সবশেষে ইন্তিকাল করেন। অপর বর্ণনায় হযরত মায়মূনা রাদিয়াল্লাহু আনহা সবশেষে ইন্তিকাল করেন।

৭. হযরত যয়নব বিনতে জাহশ রাদিয়াল্লাহু আনহা

তৃতীয় হিজরিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি ২০ হিজরিতে মদীনা শরীফে ইন্তিকাল করেন।

৮. হযরত জুওয়ায়রিয়া বিনতে হারিছ রাদিয়াল্লাহু আনহা

পঞ্চম হিজরিতে সংঘটিত বনু মুস্তালিক যুদ্ধে স্বীয় গোত্রের অন্যান্যের সাথে যুদ্ধবন্দী হিসেবে মদিনা শরীফে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দাসত্বমুক্ত করেন এবং বিয়ে করেন। ৫৬ হিজরিতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৯. মায়মূনা বিনতে হারিছ রাদিয়াল্লাহু আনহা

তিনি হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ এবং হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর খালা ছিলেন। সপ্তম হিজরিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। ৫১ কিংবা ৫৬ হিজরিতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১০. হযরত সাফিয়্যা বিনতে হুওয়াই ইব্‌ন আখতাব রাদিয়াল্লাহু আনহা

তিনি হযরত হারূন আলাইহিস সালামের বংশধর ছিলেন। ৭ হিজরিতে খায়বার থেকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে তিনি মদীনা শরীফ আসেন। তখনকার আইন অনুযায়ী তিনি দাসী হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে আসেন। নবীজি তাঁকে দাসত্ব মুক্ত করে শাদী করেন। তাঁর মুক্তিপণ মোহর হিসেবে গণ্য হয়। ৫০ কিংবা ৫২ হিজরিতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১১. হযরত যয়নব বিনতে খুযায়মাহ উম্মুল মাসাকীন (মিসকীন জননী) রাদিয়াল্লাহু আনহা

তৃতীয় হিজরিতে নবীজির সাথে তাঁর শাদী হয়। মাত্র দুই কিংবা তিন মাস তিনি নবীজির খিদমতে ছিলেন। এর মাঝেই তিনি ইন্তিকাল করেন (সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৩৬১-৩৬৪)।

ফায়দা- ১৩

উল্লিখিত এগারজনের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর সংসার করেছেন বলে প্রমাণিত। তাঁদের মধ্যে দু'জন ছাড়া বাকী সবার কবর মদীনা শরীফ *জান্নাতুল বাকী*তে অবস্থিত। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কবর মক্কা শরীফের *জান্নাতুল মুআল্লায়*। আর হযরত মায়মূনা রাদিয়াল্লাহু আনহার কবর মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফ যাবার পথে *সারিফ* নামক উপত্যকায় অবস্থিত। এ স্থানটির বর্তমান নাম *নাওরিয়্যা*, যা মক্কা শরীফ থেকে হিজরাহ রোড ধরে মদীনা শরীফে যাবার পথে *জুমমুম পৌঁছার* আগে অবস্থিত।

ফায়দা- ১৪

২০০৮ সালে আমার সিরিয়া সফরকালে দামেশ্‌ক এর *বাবুস সাগীর* নামক কবরস্থান যিয়ারত করার সুযোগ হয়। সেখানে এক জায়গায় পাশাপাশি দু'টি কবর উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা ও উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নামাঙ্কিত রয়েছে। অন্য জায়গায় আরেকটি কবর উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার নামাঙ্কিত দেখতে পাই। এগুলোর ঐতিহাসিক ভিত্তি কতটুকু তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তানগণ

১. কাসিম রাদিয়াল্লাহু আনহু

তাঁর সাথে সম্পর্কিত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর *কুনিয়াত* বা উপনাম *আবুল কাসিম* হয়েছে।

২. আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু

তাঁর অপর দু'টি নাম হলো তায়্যিব এবং তাহির।

৩. যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা

মেয়েগণের মধ্যে তিনি বড় ছিলেন। আবুল আস ইব্নুর রবীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

৪. রুকায়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা

হযরত উসমান ইব্ন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। যেদিন বদর যুদ্ধের বিজয় সংবাদ মদীনা শরীফ পৌঁছে সেদিনই তাঁর ইন্তিকাল হয়।

৫. উম্মে কুলছূম রাদিয়াল্লাহু আনহা

হযরত রুকায়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তিকালের পর হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

৬. ফাতিমা যাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহা

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। হযরত হাসান, হযরত হুসাইন ও হযরত মুহসিন রাদিয়াল্লাহু আনহুম হচ্ছেন তাঁর সন্তান।

৭. ইবরাহীম রাদিয়াল্লাহু আনহু

অষ্টম হিজরিতে মদীনা শরীফে হযরত মারিয়া কিবতিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার গর্ভে ইবরাহীম রাদিয়াল্লাহু আনহু'র জন্ম হয়। শিশুকালে তাঁর ইন্তিকাল হয়। তাঁর ইন্তিকালের সময় সম্পর্কে বলা হয়, জন্মের সাত দিন পর তিনি ইন্তিকাল করেন। অন্য বর্ণনায় সাত মাস কিংবা আট মাস পর তাঁর ইন্তিকাল হয়।

ফায়দা ১৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুত্র সন্তানগণ সবাই শিশু বয়সে ইন্তিকাল করেন। আর মেয়ে সন্তানগণ সবাই ইসলামের যুগ পান এবং তাঁর সাথে মদীনা শরীফে হিজরত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তানগণের মধ্যে একমাত্র হযরত ইবরাহীম রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া বাকি সবাই হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার গর্ভজাত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুধভাই ও বোনগণ

১. তাঁর চাচা হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু

২. আবু সালামা আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল আসাদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং উল্লিখিত দু'জন আবু লাহাবের দাসী সুওয়ায়বার দুধ পান করেন। তখন তাঁর যে শিশুসন্তান ছিলো তাঁর নাম মাসরুহ।

৩. আবু সুফ্‌য়ান ইব্‌ন হারিছ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ সুফ্‌য়ান ইব্‌ন হারিছ একত্রে হযরত হালিমা সাদিয়ার দুধ পান করেন।

৪. আবদুল্লাহ

৫. আনিসা

৬. শায়মা

হযরত হালিমা সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার স্বামী হারিছ এর ঔরসজাত উল্লিখিত তিন সন্তানও নবীজির দুধভাই ও বোন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা ও ফুফুগণ

১. সায়্যিদুশ শুহাদা হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু
২. আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু
৩. কুছাম
৪. আবূ তালিব
৫. আবূ লাহাব
৬. আবদুল কা'বা
৭. হুজাল
৮. দিরার
৯. মুকাওয়্যিম
১০. গাইদাক
১১. সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা
১২. আতিকা
১৩. উমাইয়া
১৪. বাররাহ
১৫. উম্মে হাকীম

প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী এদের মধ্যে হযরত হামযা, হযরত আব্বাস ও হযরত সাফিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। সীরাতের প্রাচীন ও মৌলিক কিতাবাদিতে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হযরত রাসূলে কারীম (স.) জীবন ও শিক্ষা শীর্ষক গ্রন্থেও এ বিষয়ে আলোচনা আছে (পৃষ্ঠা ১৬)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়াতের দায়িত্ব প্রদান

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে ওহী নাযিলের সূচনা হয় স্বপ্নের মাধ্যমে। অতঃপর তাঁর অন্তরে একাকী ধ্যানমগ্ন থাকার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এ সময় তিনি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন সময় কাটাতে শুরু করেন। যখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর তখনই হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম হেরা গুহায় কুরআন শরীফের কতিপয় আয়াত নিয়ে আগমন করেন। তা ছিলো-

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

"পড়ুন আপনার সেই রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন জমাটবাধা রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ুন আপনার সেই সম্মানিত রবের নামে, যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না" (সূরা আলাক, আয়াত ১-৫)।

বিশুদ্ধ মতানুযায়ী উল্লিখিত আয়াতগুলোই প্রথম নাযিল হয়েছে। এ ব্যাপারে অন্যান্য যে বর্ণনা রয়েছে তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মি'রাজ

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি *ফাতহুল বারী* কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, মি'রাজের সন সম্পর্কে কয়েকটি উক্তি পরিলক্ষিত হয়। তবে গ্রহণযোগ্য কথা হলো, নবুওয়াতের দায়িত্ব প্রাপ্তির একাদশ বর্ষে মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়। অনুরূপভাবে কোন মাসে মিরাজ হয়েছে তা নিয়েও উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান রয়েছে। কেউ বলেছেন, রবিউল

আউয়াল মাসে, কেউ বলেছেন রবিউল আখির মাসে, কেউ বলেছেন রজব মাসে আবার কেউ বলেছেন রামাদান মাসে। তবে প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী মি‘রাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে রজব মাসের ২৭ তারিখ (শরহে মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ৩০৭)।

মি‘রাজ কতবার হয়েছে, জাগ্রত অবস্থায় হয়েছে, নাকি স্বপ্নযোগে হয়েছে তা নিয়েও উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান রয়েছে। জমহূর মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা এবং মুতাকাল্লিমীনের বিখ্যাত মত হচ্ছে- মি‘রাজ একবারই হয়েছে এবং তা হয়েছে সশরীরে জাগ্রত অবস্থায়। মহান আল্লাহ বলেন,

سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيَاتِنَا إِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

“পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন আল-মসজিদুল হারাম থেকে আল-মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা” (সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ১)।

এ আয়াতের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মি‘রাজ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় একবার সংঘটিত হয়েছে। ইসরা ও মি‘রাজ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ২৬ জন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিজরত

বিভিন্ন উপলক্ষে মক্কা শরীফে লোকসমাগম হলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাবেশ স্থলে ছুটে যেতেন এবং লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। নবুওয়াতের দায়িত্ব প্রাপ্তির একাদশ বর্ষে হজ্জ উপলক্ষে মদীনা শরীফের ছয়জন লোক আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। তাঁরা মদীনায় ফিরে গিয়ে নিজেদের গোত্রের মধ্যে সে সংবাদ পৌঁছান। এতে সেখানকার লোকজন ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। পরবর্তী বছর মদীনা শরীফের আনসারদের মধ্য হতে বারোজন লোক আসেন। তাঁরা আকাবা নামক স্থানে (মাসজিদে হারাম থেকে মীনায় যাবার পথে মীনার নিকটবর্তী বামদিকে পাহাড় ঘেরা স্থান) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বাইআত হন। এটিই ইতিহাসে *আকাবার প্রথম বাইআত* হিসেবে চিহ্নিত। এই বারোজনের সাথে কুরআন শরীফের তিলাওয়াত এবং

ইসলামের আহকাম শিক্ষাদানের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুসআব ইব্‌ন উমায়ির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনা শরীফে প্রেরণ করলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় মদীনা শরীফের বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন।

পরবর্তী বছর (নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষ) মদীনা শরীফ থেকে ৭৩ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা মক্কা শরীফে আসেন। যখন তাঁরা পূর্বোক্ত আকাবা নামক স্থানে সমবেত হন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাচা আব্বাসকে সাথে নিয়ে তাদের কাছে গেলেন। তিনি তাদের উদ্দেশে কথা বলতে শুরু করলেন। বললেন, তোমরা কি একথার উপর বাইয়াত করবে যে, তোমরা যেরূপ আপন সত্তা এবং স্ত্রী-পুত্রগণকে আগলে রাখো ঠিক সেরূপ আমাকেও আগলে রাখবে? উত্তরে সবাই বললেন, আমরা অবশ্যই তা করবো। তখন তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের মধ্য হতে বারোজন নকীব চিহ্নিত করো যারা তাদের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে। তাঁরা বারোজন নকীব ঠিক করে নিলেন।

এরপরই নবীজি স্বীয় সাহাবাগণকে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন। এক পর্যায়ে কেবলমাত্র মুশরিকরা যাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছিলো তাঁরা এবং আবু বাক্‌র ও আলী ছাড়া সবাই হিজরত করলেন। এ অবস্থা দেখে মুশরিকরা *দারুন নাদওয়ায়* জরুরী বৈঠকে বসলো। ইবলীস লা'নাতুল্লাহি আলাইহি *শায়খে নজদী*র রূপ ধারণ করে তাদের সাথে বৈঠকে যোগ দিলো। বৈঠকে আবু জাহ্‌ল নবীজিকে হত্যা করার প্রস্তাব পেশ করলে ইবলীস তা সমর্থন করলো এবং তাতে সবাই ঐকমত্য পোষণ করলো। ইতিমধ্যে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবীজিকে মুশরিকদের বৈঠকের সংবাদ প্রদান করে সে রাতেই হিজরতের নির্দেশের কথা জানিয়ে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বাক্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে তাশরিফ নিলেন এবং হিজরতে তাঁর সঙ্গী হবার সুসংবাদ প্রদান করলেন। হযরত আবু বাক্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহু সীমাহীন খুশি হয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। সেই রাতে নবীজি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে স্বীয় বিছানায় ঘুমানোর নির্দেশ দিলেন এবং তাঁকে দায়িত্ব দিলেন যেনো তাঁর কাছে রক্ষিত বিভিন্ন আমানত যথাযথভাবে মালিকদের কাছে পৌঁছে দেন। নবীজি নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে যাবার পূর্বে মুশরিকরা তাঁকে হত্যার উদ্দেশে তাঁর ঘর ঘেরাও করে রাখে। তিনি একমুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে সূরা ইয়াসীন এর সেই আয়াত পড়ে

ফুঁ দিলেন যে আয়াতে উল্লেখ রয়েছে-

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ.

"আর আমি তাদের সামনে ও পেছনে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে তাদেরকে (মুশরিকদেরকে) ঢেকে দিলাম; তাতে তারা কিছুই দেখতে পেল না" (সূরা ইয়াসীন, আয়াত ৯)।

সেই মাটি মুশরিকদের মাথার উপর দিয়ে ছুড়ে মারলেন, তাতেই আল্লাহপাক তাদেরকে সাময়িক অন্ধ করে দিলেন। নবীজি ঘর থেকে নিরাপদে বেরিয়ে হযরত আবু বাক্র রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে *ছাওর* পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত গুহায় আশ্রয় নিলেন।

তারপর মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ল, এমনকি তারা গুহার কাছ অবধি চলে গেল। কিন্তু আল্লাহপাক দুশমনদের দৃষ্টি থেকে তাঁদের দু'জনকে আড়াল করে রাখলেন। আল্লাহর হুকুমে একটি মাকড়সা গুহার প্রবেশমুখে জাল বিস্তার করে দিল এবং এক জোড়া কবুতর সেখানে বসে ডিমে তা দিতে লাগল। সেই গুহায় তিন রাত অবস্থানের পর হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর আযাদকৃত দাস হযরত আমের ইব্ন ফুহায়রাকে সাথে নিয়ে তাঁরা উভয়ে মদীনার পথে রওয়ানা করলেন।

ফায়দা ১৬

ছানিয়্যাতুল বিদা পাহাড়ের পথ ধরে এক পর্যায়ে তাঁরা কুবায় পৌঁছে গেলেন। ইতিমধ্যে নবীজির হিজরতের সংবাদ মদীনায় পৌঁছে গিয়েছিলো। মদীনাবাসী গভীর আগ্রহে তাঁর আগমনের প্রহর গুনছিলো।

যখন জানাজানি হয়ে গেলো যে, নবীজি কুবায় চলে এসেছেন; মদীনাবাসীগণ তাঁকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন।

নবীজি কুবায় আসেন ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার দিন। কিছু দিন সেখানে অবস্থানের পর তিনি মদীনায় চলে আসেন। যেদিন নবীজি কুবা থেকে মদীনায় শুভাগমন করেন সেদিনটি ছিলো শুক্রবার।

নবীজির শুভাগমনে মদীনাবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেয়ে উঠে-

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّا الْوِدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعِ

"ছানিয়্যাতুল বিদা পাহাড়ের চূড়া থেকে পূর্ণিমার চাঁদ আমাদের নিকট উদিত হল। যতক্ষণ আল্লাহকে ডাকার মত কেউ অবশিষ্ট থাকবে, তাঁর শোকর আদায় করা আমাদের উপর ওয়াজিব হয়ে পড়েছে।"

ফায়দা ১৭

হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম *ছানিয়্যাতুল বিদা'* পাহাড়ের পথ দিয়ে যে মদীনা শরীফে প্রবেশ করেছিলেন, অনেকে তা অস্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, *ছানিয়্যাতুল বিদা'* পাহাড়টি মদীনা শরীফের উত্তর দিকে তাবূকের পথে অবস্থিত। তাবূক অভিযানশেষে নবীজি *ছানিয়্যাতুল বিদা'* পাহাড়ের পথ দিয়ে মদীনা শরীফে প্রবেশ করেছিলেন। আর হিজরতের সময় তিনি মদীনা শরীফের দক্ষিণ দিক থেকে শহরে প্রবেশ করেন। সুতরাং *ছানিয়্যাতুল বিদা'* পাহাড় সে পথে পড়ে না।

তাঁরা আরো বলেন যে, মদীনাবাসীরা *তালাআল বাদরু আলাইনা- মিন ছানিয়্যাতুল বিদা'* কাসীদাটি নবীজি তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় গেয়েছিলো, হিজরতের সময় নয়। কিন্তু গভীর অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার ফলে জানা যায় যে, মদীনা শরীফের পার্শ্ববর্তী এলাকায় *ছানিয়্যাতুল বিদা'* নামে দুটি পাহাড় রয়েছে। একটির অবস্থান উত্তর দিকে তাবূকের পথে। অন্যটির অবস্থান দক্ষিণ দিকে মক্কা শরীফের পথে। সুতরাং নবীজি হিজরতের সময় *ছানিয়্যাতুল বিদা'* পাহাড়ের পথ ধরেই মদীনা শরীফে প্রবেশ করেন। তাঁকে স্বাগত জানাতে মদীনাবাসী তখনই এ কাসীদা আবৃত্তি করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আযাদকৃত দাসগণ

১. যায়িদ ইব্ন হারিছা রাদিয়াল্লাহু আনহু
২. আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু
৩. আবু কাবশা রাদিয়াল্লাহু আনহু
৪. শোকরান রাদিয়াল্লাহু আনহু
৫. রাবাহ আন নাওবী রাদিয়াল্লাহু আনহু
৬. ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু (উরায়নার ঘটনায় শহীদ হন)
৭. মুদইম রাদিয়াল্লাহু আনহু
৮. আনজাশা রাদিয়াল্লাহু আনহু
৯. সফীনা ইব্ন ফারুখ রাদিয়াল্লাহু আনহু (তাঁর নাম মিহরান)
১০. আফলাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু
১১. উবাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু
১২. যাকওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু
১৩. ফুদালা রাদিয়াল্লাহু আনহু

১৪. ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু
১৫. তাহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাসীগণ

১. মারিয়া কিবতিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা
তিনি ছিলেন নবীজির শিশুপুত্র হযরত ইবরাহীমের জননী। ইসকান্দারিয়ার (মিসর) বাদশা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে তাঁকে হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন।
২. রায়হানা রাদিয়াল্লাহু আনহা
৩. সালামা উম্মে রাফে‘ রাদিয়াল্লাহু আনহা
৪. রাযীনা রাদিয়াল্লাহু আনহা
৫. মায়মুনা বিনতে সা‘দ রাদিয়াল্লাহু আনহা
৬. রাফিনাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা
৭. রাদওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা

ফায়দা ১৮

ইমাম ইবনুল জাওযী প্রমুখ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আযাদকৃত দাসের সংখ্যা তেতাল্লিশ এবং দাসীর সংখ্যা এগারো। তবে এ সকল দাস-দাসী একই সময়ে তাঁর কাছে ছিলো না, বরং বিভিন্ন সময়ে ছিলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কয়েকজন খাদেম

পুরুষদের মধ্যে
১. আনাস ইব্‌ন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু
২. আয়মান ইব্‌ন উম্মে আয়মান রাদিয়াল্লাহু আনহু
৩. আবু যার গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু
৪. মুহাজির রাদিয়াল্লাহু আনহু (হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা’র আযাদকৃত দাস)
৫. নাঈম ইব্‌ন রাবিআ আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু
৬. আবুল হামরা রাদিয়াল্লাহু আনহু
৭. আবুস সামহা রাদিয়াল্লাহু আনহু
৮. আবুস্‌ সাম্‌হ রাদিয়াল্লাহু আনহু

মহিলাদের মধ্যে

১. বারাকাহ উম্মে আয়মান রাদিয়াল্লাহু আনহা
২. খাওলাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা (হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র দাসী)
৩. সালামা উম্মে রাফে' রাদিয়াল্লাহু আনহা
৪. মায়মূনা বিনতে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহা (নবীজির ছাহেবজাদী হযরত রুকায়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র আযাদকৃত দাসী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কিছু কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবী

১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু
তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিসওয়াক, উযুর পাত্র, জুতা মুবারক এবং হেলান দিয়ে বসার বালিশ সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

২. হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু
তাঁর দায়িত্ব ছিলো দৈনন্দিন পারিবারিক বাজার ও ব্যয়ের ব্যবস্থা করা।
৩. হযরত মুআয়কিব ইব্‌ন আবু ফাতিমা দাওসী রাদিয়াল্লাহু আনহু
তাঁর দায়িত্ব ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সীলমোহর সংরক্ষণ করা।
৪. হযরত আবু রাফে' আসলাম রাদিয়াল্লাহু আনহু
তাঁর দায়িত্ব ছিলো নবীজির ভারী জিনিসপত্র উঠিয়ে দেয়া।
৫. হযরত উতবা ইব্‌ন আমের জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু
তাঁর দায়িত্ব ছিলো নবীজির খচ্চর দেখাশুনা এবং সফরকালে এটি চালিয়ে নেয়া।
৬. হযরত আসলাম ইব্‌ন শারীক রাদিয়াল্লাহু আনহু
তাঁর দায়িত্ব ছিলো উট বা ঘোড়ার পিঠে বসার জিনপোষ ঠিক করে দেয়া।
৭. হযরত খালিদ ইব্‌ন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু
তাঁর দায়িত্ব ছিলো নবীজির উট রক্ষণাবেক্ষণ করা।
৮. হযরত যার ইব্‌ন আবু যার গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু
তাঁর দায়িত্ব ছিলো নবীজির দুধের উটনীকে উপত্যকায় চরানো।
এছাড়া একজন ইহুদী ছেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

গৃহস্থালি বিভিন্ন ফুট ফরমায়স প্রতিপালনে সাহায্য করতো। ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবীজি তাকে দেখতে যান। মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়ানো ছেলেটিকে নবীজি ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করেন।

বিভিন্ন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেহরক্ষীগণ

১. হযরত আবু বাক্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহু
২. হযরত সা'দ ইব্‌ন মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু
বদর যুদ্ধে আরীশে অবস্থানকালীন নবীজির দেহরক্ষী হিসেবে এ দুজন দায়িত্ব পালন করেন।
৩. হযরত যাকওয়ান ইব্‌ন আবদে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু
৪. হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলমা রাদিয়াল্লাহু আনহু
ওহুদ যুদ্ধের দিন এ দুজন নবীজির দেহরক্ষী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
৫. হযরত যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু
খন্দকের যুদ্ধে নবীজির দেহরক্ষী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
৬. হযরত আব্বাদ ইব্‌ন বিশ্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহু
৭. হযরত সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু
৮. হযরত আবু আইউব রাদিয়াল্লাহু আনহু
খায়বার যুদ্ধে এ তিনজন নবীজির দেহরক্ষী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
৯. হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু
ওয়াদিল কুরা যুদ্ধে নবীজির দেহরক্ষী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এছাড়া সাহাবাগণ পরামর্শ করে রাত্রিবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গৃহের বাইরে নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগ করেছিলেন। যখন এই আয়াত নাযিল হলো-

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ.

“আল্লাহ আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন” (সূরা মায়িদা, আয়াত ৬৭), তখন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেহরক্ষী নিয়োগ করা বাদ দিলেন (তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড ৩, পৃ. ১৫৩)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত মুয়াযযিনগণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চারজন মুয়াযযিন ছিলেন। তাঁরা হলেন-

১. হযরত বিলাল ইব্ন রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু।
তিনি হলেন নবীজির প্রথম মুয়াযযিন।

২. হযরত আমবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু আনহু (অন্ধ সাহাবী)
এ দু'জন মসজিদে নববীতে আযান দিতেন।

৩. হযরত সা'দ আল কারায রাদিয়াল্লাহু আনহু
তিনি মসজিদে কুবার মুয়াযযিন ছিলেন।

৪. হযরত আবু মাহযূরা (তাঁর নাম- আওস ইব্ন মুগীরা জুমাহী) রাদিয়াল্লাহু আনহু
তিনি মক্কা শরীফে মসজিদে হারামের মুয়াযযিন ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কবিগণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কয়েকজন কবি ছিলেন। কাফিররা ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব অপপ্রচার করতো তাঁরা কাব্যে তার জবাব দিতেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করতেন। সেই কবিগণ হলেন-

১. হযরত হাসসান ইব্ন ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু
২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু
৩. হযরত কা'ব ইব্ন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু

এই তিনজনের মধ্যে প্রথম দুজন কাফিরদের বিরুদ্ধে অধিক কঠোর ছিলেন। কুফ্র ও শিরকের ভর্ৎসনায় তাঁরা কঠোর ভাষায় কবিতা রচনা করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত লেখকগণ

১. হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু
২. হযরত উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহু

৩. হযরত উসমান ইব্ন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু
৪. হযরত আলী ইব্ন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু
৫. হযরত খালিদ ইব্ন সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু
৬. হযরত হানযালা ইব্নুর রাবী‘ রাদিয়াল্লাহু আনহু
৭. হযরত যায়িদ ইব্ন ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু
৮. হযরত শুরাহবিল ইব্ন হাসানাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু
৯. হযরত আলা ইব্ন হাসানাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু
১০. হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু
১১. হযরত মুগীরা ইব্ন শু‘বা রাদিয়াল্লাহু আনহু
১২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু
১৩. হযরত মুয়াবিয়া ইব্ন আবু সুফ্য়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা
১৪. হযরত তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু
১৫. হযরত যুবায়ির ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু
১৬. হযরত আমের ইব্ন ফুহায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু
১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু
১৮. হযরত উবাই ইব্ন কা‘ব রাদিয়াল্লাহু আনহু
১৯. হযরত ছাবিত ইব্ন কায়িস ইব্ন শাম্মাস রাদিয়াল্লাহু আনহু
২০. হযরত হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু

এদের মধ্যে হযরত মুয়াবিয়া এবং হযরত যায়িদ ইব্ন ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সার্বক্ষণিক বিশেষ দায়িত্ব পালন করতেন।

বিভিন্ন রাজা বাদশাহর কাছে প্রেরিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দূতগণ

১. হযরত আমর ইব্ন উমাইয়া আদ দামারী রাদিয়াল্লাহু আনহু

তিনি প্রথম দূত যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবশার (আবিসিনিয়া) বাদশা নাজ্জাশীর (তাঁর নাম আসহামা) কাছে প্রেরণ করেছিলেন। নাজ্জাশী দূত মারফত প্রাপ্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এর পত্র নিজের চোখের উপর রাখলেন। সেই সাথে রাজকীয় আসন ছেড়ে মাটিতে বসে পড়লেন এবং ইসলাম কবুল করলেন। অষ্টম হিজরিতে নাজ্জাশী ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফে তাঁর গায়েবানা জানাযা পড়েন।

২. হযরত দিহ্য়া ইব্ন খালীফা কালবী রাদিয়াল্লাহু আনহু

তিনি রোমের অধিপতি কায়সার (তার নাম হিরাক্ল) এর কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চিঠি পড়ে সম্রাট কায়সার ইসলামের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন। কিন্তু রোমানরা তাঁর বিরোধিতা করবে এবং রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে এই ভয়ে সম্রাট ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা আস সাহ্মী রাদিয়াল্লাহু আনহু

তিনি পারস্যরাজ কিসরার কাছে (তার নাম আবরুইয ইব্ন হরমুয) প্রেরিত হয়েছিলেন। কিসরা দূত মারফত প্রাপ্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পত্রখানা ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল। কিসরার এ অসৌজন্যমূলক আচরণের বিবরণ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আল্লাহপাক তার রাজত্বকে এভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবেন। অতঃপর ঠিকই অল্প কালের মধ্যে তার রাজত্বকে আল্লাহপাক ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

৪. হযরত হাতিব ইব্ন আবি বালতাআ রাদিয়াল্লাহু আনহু

তিনি ইস্কান্দারিয়ার (মিসর) বাদশাহ মুকাওকিস এর কাছে (তার নাম জুরায়িজ ইব্ন মাইনা) প্রেরিত হয়েছিলেন। বাদশাহ মুকাওকিস দূত মারফত প্রাপ্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পত্র পড়ে ইসলামের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন। তিনি নবীজির খিদমতে হাদিয়া স্বরূপ মারিয়া কিবতিয়া ও সিরীন নাম্নী দুজন দাসী (অন্য বর্ণনায় চারজন দাসী), একটি খচ্চর (দুলদুল), এক হাজার দীনার, বিশ জোড়া কাপড় এবং একটি গাধা (আফির) প্রেরণ করেন।

৫. হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু

তিনি ওমানের দুই সহোদর বাদশাহ জীফার ও আবদ (উভয়ের পিতা আলজুলান্দী) এর কাছে প্রেরিত হন। উভয় বাদশাহ দূত মারফত প্রাপ্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পত্র পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৬. হযরত সালীত ইব্ন আমর আল আমিরী রাদিয়াল্লাহু আনহু

তিনি ইয়ামামার সরদার হাওযা ইব্ন আলীর কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। হাওযা দূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, তবে ইসলাম গ্রহণ করেননি।

৭. হযরত শুজা' ইব্ন ওয়াহাব আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু

তিনি শামের বাদশাহ হারিছ ইব্ন আবু সামার গাসসানীর কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। গাসসানী দূত মারফত প্রাপ্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এর পত্র ছুড়ে ফেলে দেয় এবং বলে, আমি তাঁর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করবো। কিন্তু সম্রাট কায়সার তাকে যুদ্ধ ঘোষণা থেকে বিরত রাখেন।

৮. হযরত মুহাজির ইব্‌ন আবু উমাইয়া মাখযুমী রাদিয়াল্লাহু আনহু

তিনি ইয়ামানের হারিছ আল হুমাইরির কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন।

৯. হযরত আলা আল হাদরামী রাদিয়াল্লাহু আনহু

তিনি বাহরাইনের বাদশাহ মুনযির ইব্‌ন সাওয়ার কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। দূত মারফত প্রাপ্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পত্র পড়ে মুনযির ইসলাম গ্রহণ করেন।

১০-১১. হযরত আবূ মূসা আশআরী ও হযরত মুআয ইব্‌ন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুমা

তাঁরা উভয়ে ইয়ামনবাসীর কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। ইয়ামনের সাধারণ মানুষ এবং বাদশাহ কোনোরূপ যুদ্ধ কিংবা তর্কবিতর্ক ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সেনাপতিত্বে পরিচালিত গাযওয়া বা যুদ্ধসমূহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিটি গাযওয়া বা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা হিজরত-পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। মূলত আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে আয়াত নাযিলের পর থেকে যুদ্ধের অনুমতি মিলে। আল্লাহপাক ঘোষণা করেন-

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ.

“তাদের জন্য যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো, কেননা তারা অত্যাচারিত হচ্ছে। আর অবশ্যই আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে ক্ষমতা রাখেন” (সূরা হজ্জ, আয়াত ৩৯)।

মোট কতটি গাযওয়া সংঘটিত হয়েছে তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন পঁচিশটি, কেউ সাতাশটি, কেউ ঊনত্রিশটি। আবার কেউ অন্যরকমও বলেছেন।

গাযওয়াগুলো হলো

১. গাযওয়া ওয়াদ্দান ২. গাযওয়া বূওয়াত ৩. গাযওয়া উশায়রা ৪. গাযওয়া বদর আল উলা ৫. গাযওয়া বদর আল কুবরা ৬. গাযওয়া কারকারাতুল কিদ্‌র ৭. গাযওয়া বনি কায়নুকা ৮. গাযওয়া সাবীক ৯. গাযওয়া গাতাফান ১০. গাযওয়া বুহরান ১১. গাযওয়া উহুদ ১২. গাযওয়া হামরাউল আসাদ ১৩. গাযওয়া বনি নাযীর

১৪. গাযওয়া যাতুর রিকা' ১৫. গাযওয়া বদর আল আখিরাহ ১৬. গাযওয়া দুমাতুল জান্দাল ১৭. গাযওয়া আল মুরাইসি ১৮. গাযওয়া খন্দক ১৯. গাযওয়া বনি কুরাইযা ২০. গাযওয়া বনি লিহয়ান ২১. গাযওয়া আলগাবাহ ২২. সুলহে হুদায়বিয়া ২৩. গাযওয়া খায়বার ২৪. গাযওয়া ওয়াদিল কূরা ২৫. উমরাতুল কাযা ২৬. মক্কা বিজয় ২৭. গাযওয়া হুনাইন ২৮. গাযওয়া তায়েফ ২৯. গাযওয়া তাবূক।

তন্মধ্যে নয়টিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সারিয়া (ক্ষুদ্র যুদ্ধাভিযানসমূহ)

গাযওয়ার সংখ্যা নিয়ে যেরূপ মতানৈক্য রয়েছে, সারিয়ার সংখ্যা নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন সাতচল্লিশটি, কেউ পঞ্চাশটি আবার কেউ বলেছেন ছাপ্পান্নটি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিয়োগকৃত আমীর ও গভর্নরগণ

কিসরা নিহত হবার পর বাযান ইব্‌ন সাসান ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পুরো ইয়ামানের আমীর নিয়োজিত করেন। ইসলামের ইতিহাসে তিনিই প্রথম আমীর। বাযানের ইন্তিকালের পর তাঁর পুত্র শাহ্‌র ইব্‌ন বাযানকে নবীজি সানআর আমীর নিযুক্ত করেন। শাহ্‌র ইব্‌ন বাযান নিহত হলে পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আসকে সানআর আমীর নিযুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ইব্‌ন আবু উমাইয়া মাখযুমীকে *কিন্দাহ* ও *সাদাফে*র গভর্নর নিয়োগ করেন। যায়িদ ইব্‌ন উমাইয়া আনসারীকে *হাদারামাওতে*র গভর্নর নিয়োগ করেন। আবূ মূসা আশআরীকে *যাবীদ আদন* ও *সাহিল* এর গভর্নর নিয়োগ করেন। মুআয ইব্‌ন জাবালকে *জুন্দ* এর গভর্নর নিয়োগ করেন। আবু সুফ্‌য়ান ইব্‌ন সাখর ইব্‌ন হারবকে *নাজরানে*র গভর্নর নিয়োগ করেন। তার পুত্র ইয়াযিদকে *তায়মা*র গভর্নর নিয়োগ করেন। আত্তাব ইব্‌ন আসীদকে *মক্কা*র গভর্নর নিয়োগ করেন। আলী ইব্‌ন আবু তালিবকে ইয়ামানের *আখমাস* এলাকার গভর্নর ও কাযী নিয়োগ করেন। আমর ইবনুল আসকে *উমান* ও তার আশপাশ এলাকার গভর্নর নিয়োগ করেন।

এছাড়া নবম হিজরিতে হযরত আবূ বাক্‌রকে হজ্জের আমীর নিয়োগ করেন। লোকজনকে সূরা বারাআত (তাওবাহ) পড়ে শুনানো এবং নবীজির পক্ষে জরুরী ঘোষণা প্রদানের জন্য তাঁর পশ্চাতে হযরত আলীকে প্রেরণ করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিদায় হজ্জ

অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী নবম হিজরিতে ইসলামে হজ্জ ফরয হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সায়্যিদুনা আবূ বাক্‌র সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হজ্জের আমীর নিযুক্ত করে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেনো আরাফাতে ঘোষণা করেন যে, এ বছরের পর থেকে আর কোনো মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কেউ আর উলঙ্গ হয়ে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে পারবে না। সায়্যিদুনা আবূ বাক্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহুর পশ্চাতে সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন যেনো তিনি হজ্জযাত্রীদেরকে সূরা তাওবা পাঠ করে শুনান।

দশম হিজরিতে নবীজি হজ্জ করার ইচ্ছা করেন। তাঁর এ ইচ্ছার কথা সবাইকে জানিয়ে দেয়া হলো। মদীনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেরা দলে দলে কাফেলায় যোগদান করলো। যুলকা'দাহ মাসের শেষদিকে (৬ দিন বাকি থাকতে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সহধর্মিনীগণ এবং কন্যা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাসহ রওয়ানা হলেন। পথে পথে অগণিত লোক কাফেলায় যোগ দিলো। আরাফাতে নবীজি খুতবা প্রদান করেন। এ খুতবাই ইতিহাসে '*বিদায় হজের ভাষণ*' নামে খ্যাত। খুতবাশেষে নবীজি যোহর ও আছরের নামায একত্রে আদায় করেন। এরপর আল্লাহর যিকির ও দোয়ায় মনোনিবেশ করেন। সে বছর আরাফার দিনটি ছিলো শুক্রবার। আরাফাত ময়দানে অবস্থানকালে ওহী নাযিল হলো-

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

"আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাংগ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য আমার নিয়ামতরাযিও পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্য ইসলামকেই একমাত্র দীন হিসেবে মনোনীত করলাম" (সূরা মায়িদা, আয়াত ৩)।

হজ্জশেষে নবীজি মদীনা তায়্যিবায় ফিরে আসেন, অতঃপর তিন মাসের মধ্যে ইন্তিকাল করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উমরা

মদীনায় হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট চারবার উমরা পালনের জন্য মক্কা শরীফে গমন করেন। প্রথমবার ষষ্ঠ হিজরিতে। এবার *হুদায়বিয়া* পৌঁছার পর মক্কার মুশরিকরা বাধা প্রদান করে। ইতিহাসখ্যাত *হুদায়বিয়ার সন্ধি* সম্পাদন করে ইহরাম ভঙ্গ করে সেখান থেকেই নবীজি মদীনায় ফিরে আসেন। পরবর্তী বছর (সপ্তম হিজরি) *উমরাতুল কাযা* আদায় করেন। এ উপলক্ষে তিনি মাত্র তিন দিন মক্কা শরীফে অবস্থানশেষে মদীনা তায়্যিবায় ফিরে আসেন।

মক্কা বিজয়শেষে (অষ্টম হিজরি) নবীজি হুনাইন অভিযানে গমন করেন। অভিযানশেষে মক্কা শরীফে প্রত্যাবর্তনকালে *জি'রানা* নামক স্থান থেকে ইহরাম পরিধান করে উমরা আদায় করেন।

চতুর্থবার বিদায় হজ্জের সাথে (দশম হিজরি) উমরা করেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, সায়্যিদুনা আনাস ইব্‌ন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরা পালনের জন্য চারবার মক্কা শরীফে গমন করেছেন। একমাত্র হজ্জের সাথে আদায়কৃত উমরা ছাড়া অন্য তিন উমরা ছিলো যুলকা'দা মাসে।

ফায়দা ১৯

হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট পাঁচবার মক্কা শরীফে গিয়েছেন। প্রথমবার মক্কা শরীফে পৌঁছার পূর্বে *হুদায়বিয়া* নামক স্থানে মক্কার মুশরিকরা বাধা প্রদান করে। *হুদায়বিয়া সন্ধি*র পরবর্তী বছর *উমরাতুল কাযা* আদায়ের জন্য দ্বিতীয়বার যান। মক্কা বিজয়কালে (অষ্টম হিজরি রামাদান মাস) ইহরাম ছাড়াই তৃতীয়বার মক্কায় প্রবেশ করেন। হুনাইন অভিযানশেষে *জি'রানা* নামক স্থান থেকে ইহরাম পরিধান করে চতুর্থবারের মতো মক্কায় প্রবেশ করেন। আর পঞ্চমবার মক্কায় প্রবেশ করেন বিদায় হজের সময় দশম হিজরিতে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় মু'জিযা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অগণিত মু'জিযা রয়েছে। কেউ এগুলো একত্রে জমা করে লিখলে বিশাল গ্রন্থ হবে। মূলত কেবলমাত্র মু'জিযাতুন্নবী বিষয়ে আরবি, উর্দু ও বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় যুগে যুগে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। নিম্নে আমরা কতিপয় মু'জিযা সংক্ষিপ্তরূপে উল্লেখ করছি।

১. কুরআনুল কারীম

উলামায়ে কিরাম মত ব্যক্ত করেছেন যে, কুরআনুল কারীম হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে বড় মু'জিযা এবং তাঁর নবুওয়াতের দলীল। শব্দ এবং অর্থের দিক থেকে কুরআনুল কারীমের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা উলামায়ে কিরাম নিজ নিজ কিতাবে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। কুরআনুল করিম-এর সবচেয়ে বড় মু'জিযা এই যে, এযাবতকাল পর্যন্ত কুরআনের অনুরূপ একটি আয়াত তৈরি করা বা এর একটি আয়াত বা শব্দ পরিবর্তন করতে কেউ সক্ষম হয়নি। এ সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেছেন,

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا

"বলুন, যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন জাতি সমবেত হয় তবুও তারা কুরআনের অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না, যদিও তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে" (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৮৮)।

এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামত পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের একটি সূরা বা একটি শব্দ তৈরী করা বা পরিবর্তন করা কারো দ্বারা সম্ভব হবে না।

২. ঊর্ধ্বজগতের সাথে সম্পর্কিত মু'জিযাসমূহ

ক) ইসরা ও মি'রাজ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর *ইসরা* সম্পর্কে কোনো মতানৈক্য নেই, যেহেতু তা কুরআন শরীফের আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত। এছাড়া এর বিস্তারিত বর্ণনা এবং আশ্চর্য ঘটনাবলীর কথা হাদীস শরীফে উল্লিখিত হয়েছে। এ সম্পর্কে ত্রিশজন সাহাবী (পুরুষ ও মহিলা) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

খ) চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা

ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা সম্পর্কিত হাদীস সাহাবীগণের একটি বড় দল বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে তাবিঈগণের বিশাল গ্রুপ বর্ণনা করেছেন। এভাবেই বড় দলের বর্ণনাসূত্রে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা সম্পর্কিত হাদীস আমাদের কাছে পৌঁছেছে। ইমাম সুবকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমার মতে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার

বিষয়টি কুরআন শরীফ এবং বুখারী ও মুসলিম শরীফসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবাদিতে উল্লিখিত হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

গ) অস্তমিত সূর্য ফেরত আনা

আসমা বিনতে উমায়িস রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কোলে মাথা মুবারক রাখা অবস্থায় একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ওহী নাযিল হচ্ছিল। এ অবস্থায় সূর্য অস্ত গেলো অথচ হযরত আলী আসরের নামায আদায় করেন নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, আলী! তুমি কি আসরের নামায আদায় করছো? আলী জবাব দিলেন, করিনি। তখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আলী তোমার ও তোমার রাসূলের আনুগত্যে রত ছিলো। তার জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে দাও। আসমা বলেন, আমি দেখলাম অস্তমিত সূর্য আবার উদিত হলো এবং পাহাড় ও মাঠের মাঝে অবস্থান করলো। অস্তমিত সূর্য পুনরায় উদিত হবার ঘটনা *খায়বারের সাহবা* নামক স্থানে সংঘটিত হয়।

ইমাম তাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লিখিত হাদীস স্বীয় *মুশকিলুল আছার* নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাহাবী ও ইমাম কাযী আয়ায রাহিমাহুমাল্লাহ এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। এছাড়া ইমাম তাবারানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি *আল মু'জামুল কাবীর* কিতাবে হযরত আসমা বর্ণিত এ হাদীসকে হাসান বলে বর্ণনা করেছেন।

ঘ) সূর্য থেমে যাওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মক্কাবাসীর কাছে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করলেন, এমনকি মক্কার একটি ব্যবসায়ী কাফেলাকে দেখেছেন বলে উল্লেখ করলেন। তারা ব্যবসাশেষে মক্কায় ফেরত আসছিল। মক্কার কাফির নেতৃবৃন্দ জানতে চাইলো, কাফেলা কবে ফিরে আসবে? নবীজি বললেন, বুধবার দিন ফিরে আসবে। কাফিররা তাঁর কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য বুধবার দিন অপেক্ষা করতে লাগলো। এদিকে সূর্য অস্ত গিয়ে বুধবার দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে নবীজি দোয়া করলেন। দোয়ার বরকতে সূর্যের গতি থামিয়ে আল্লাহপাক সে দিনকে দীর্ঘ করে দিলেন।

অনুরূপভাবে খন্দকের দিনও আসরের নামাযে বিলম্ব হবার কারণে আমাদের নবীর জন্য সূর্যকে থামিয়ে দেয়া হয়েছিল। সূর্যকে থামিয়ে দেয়ার মু'জিযা আমাদের নবী এবং হযরত ইউশা ইব্ন নূন আলাইহিস সালামের বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে গণ্য। ইমাম কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

বর্ণিত এ বিষয়টি পরবর্তীতে ইমাম নববী, ইমাম ইবনে হাজার ও ইমাম মুগলতাঈও বর্ণনা করেছেন।

৩. মৃতকে জীবিত করা

ক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাতা-পিতাকে জীবিত করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতা-মাতা সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের চারটি মত রয়েছে। প্রত্যেক মতেই তাঁরা উভয়ে নাজাতপ্রাপ্ত।

প্রথমত' তাঁরা উভয়ে অল্প বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাই তাঁদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি। আর যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছেনি তাদের বিধান হচ্ছে যে, তাদের কোন শাস্তি হবে না, বরং তারা জান্নাতী হবেন।

দ্বিতীয়ত' তাঁরা উভয়ে আহলে ফিতরাত ছিলেন। হাদীসের ভাষ্যমতে কিয়ামতের দিন আহলে ফিতরাতের পরীক্ষা নেয়া হবে। যারা সেই পরীক্ষার সময় আনুগত্য স্বীকার করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর যারা আনুগত্য স্বীকার করবে না তারা জাহান্নামে যাবে।

উল্লিখিত বিষয়টি আলোচনা করে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি মনে করি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাতা-পিতাসহ পূর্বপুরুষের যারাই ফিতরাতের উপর ইন্তিকাল করেছেন, কিয়ামত দিবসে পরীক্ষার সময় নবীজির প্রশান্তির জন্য সবাই আনুগত্য স্বীকার করে নেবেন।

তৃতীয়ত' তাঁরা উভয়ে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ধর্মমত তথা *দীনে হানীফে*র অনুসারী ছিলেন। একথার উপর জোর দিয়ে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতা হযরত আবদুল্লাহ থেকে শুরু করে আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত পূর্বপুরুষের সবাই তাওহীদবাদী ছিলেন।

চতুর্থত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য তাঁর মাতা-পিতাকে জীবিত করা হয়েছিলো। তাঁরা নবীজির উপর ঈমান এনে আবার ইন্তিকাল করেছেন।

এ মতটির পক্ষে বিপুল সংখ্যক ইমাম রায় দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: ইমাম আবূ বাক্র খতীব বাগদাদী, ইমাম আবুল কাসিম ইবনে আসাকির, ইমাম ইবনে শাহীন, ইমাম সুহায়লী, ইমাম কুরতুবী, ইমাম মুহিব্বুদ্দীন ও ইমাম ইবনে সায়্যিদিন নাস।

ইমাম যুরকানী *শারহু মাওয়াহিবিল্লাদুন্নিয়্যায়* নবীজির মাতা-পিতাকে জীবিত করা বিষয়ক হাদীস উল্লেখ করে বলেন, এই হাদীস এর বিপরীতে বর্ণিত হাদীসের *নাসিখ* বা রহিতকারী। কেননা এ হাদীস বিপরীতে বর্ণিত হাদীসের পরবর্তীতে ইরশাদ করেছেন। সুতরাং উভয় হাদীসের *তাআরুদ* বা বৈপরীত্য থাকে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতা- পিতার নাজাত বিষয়ে খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনার সমাপ্তি লগ্নে দু'টি হাদীস উল্লেখ করে এ দুই হাদীসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পেশ করা দরকার। প্রথম হাদীস-

عن ابي هريرة رَضِيَ الله عنه قال : زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وأبكى من حوله ، فقال استأذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي و استأذنته في ازور قبرها فاذن لي ، فزوروا القبور فانها تذكركم الموت.

"আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করলেন। তখন তিনি কাঁদলেন এবং চারপাশে যারা ছিলো সবাইকে কাঁদালেন। অতঃপর বললেন, আমি আমার রবের কাছে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয় নি। তবে আমি তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চেয়েছিলাম সে অনুমতি আমাকে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা তা মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়"। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানাইয, বাব ৩৬, নং ২২৫৯, সুনান নাসাঈ, কিতাবুল জানাইয, নং ২০৩৬, সুনান ইবনু মাজা, কিতাবুল জানাইয, নং ১৫৭২)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু কর্তৃক বর্ণিত উল্লিখিত হাদীসের অনেক ব্যাখ্যা মুহাদ্দিসীনে কিরাম দিয়েছেন। ইমাম মোল্লা আলী কারী রাহিমাহুল্লাহ (ওফাত ১০১৪ হিজরি) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ'র (ওফাত ৮৫২ হিজরি) বরাতে বলেন-

ولعل حكمة عدم الاذن في الاستغفار لها اتمام النعمة عليه باحياءها له بعد ذٰلك حتى تصير من اكابر المؤمنين ، أو الإمهال إلى إحياءها لتؤمن به فتستحق الاستغفار الكامل حينئذٍ.

"সেসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মায়ের জন্য ইস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি প্রদান না করার হিকমত হলো- তাঁর উপর সেই নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দেয়া হবে যেনো তাঁর মাকে পরবর্তীতে জীবিত

করে দেয়া হবে এবং তিনি ঈমান আনয়ন করেন। অথবা তাঁকে জীবিত করা পর্যন্ত ইস্তেগফার করতে বিরত রাখা হয়েছে যাতে জীবিত হয়ে তিনি ঈমান আনয়নের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ইস্তেগফার হয়ে যায়" (মিরকাতুল মাফাতীহ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৫০)।

ইমাম আলী কারী বলেন-

وأما قول ابن حجر وحديث احياءهما حتى اٰمنا به ثم توفيا حديث صحيح وممن صححه الامام القرطبي والحافظ بن ناصر الدين.

"ইমাম ইবনু হাজার'র কথা বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র মাতা পিতাকে জীবিতকরণ এবং তাঁর উপর উভয়ের ঈমান আনয়ন সম্পর্কিত হাদীস (সনদের দিক থেকে) সহীহ। যারা এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন তন্মধ্যে রয়েছেন ইমাম কুরতুবী (ওফাত ৬৭১ হিজরি), ইমাম হাফিয ইবনে নাসিরুদ্দিন (ওফাত ৮৪২ হিজরি) প্রমুখ" (মিরকাতুল মাফাতীহ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৫১)।

দ্বিতীয় হাদীস-

عن انس رَضِيَ الله عنه قال : ان رجلاً قال يَا رسول الله أين ابي ؟ قال في النار فلما قفا دعاه وقال ان ابي واباك في النار.

"হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো- হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাবা কোথায়? বললেন, জাহান্নামে। লোকটি যখন মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল তাকে ডাকিয়ে আনলেন। বললেন, আমার বাবা এবং তোমার বাবা (উভয়ে) জাহান্নামে" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, নং ২০৩, সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, নং ৪৭১৮)।

এই হাদীসে বাহ্যত স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা নাজাতপ্রাপ্ত নয়। কিন্তু যুগে যুগে ইলমে হাদীসে বিশেষজ্ঞ ইমামগণ এই হাদীসের অনেক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন, যাতে একথা প্রমাণিত হয় যে, হাদীসটি সনদের দিক থেকে সহীহ হলেও দলীল হিসেবে অকাট্য নয়। যেমন-

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহ (ওফাত ৯১১ হিজরি) স্বীয় التعظيم والمنة في ان أبوي رسول الله في الجنة কিতাবে এই হাদীসটির সনদ ও মতনের সুক্ষ্ম ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে বিস্তারিত পর্যালাচনা করেছেন।

এখানে বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই। উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যা কেউ বিস্তারিত জানতে চাইলে ইমাম সুয়ূতির কিতাবখানি পড়তে পারেন।

ইমাম সুয়ূতি তাঁর দীর্ঘ আলোচনার সারসংক্ষেপে বলেন-

الأحاديث التى وردت أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النار كلها منسوخة اما باحياءهما واما بالوحي في ان اهل الفترة لا يعذبون.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের পিতা-মাতা জাহান্নামী এ বিষয়ে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে সবই মানসূখ বা রহিত। হয়তবা তাঁদের উভয়কে জীবিত করা এবং তাঁর উপর ঈমান আনা বিষয়ে বর্ণিত হাদীস দ্বারা রহিত হয়েছে; কিংবা সেই ওহী (কুরআনুল কারীমের আয়াত) দ্বারা রহিত হয়েছে, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আহলে ফিতরাত যারা তাদের শাস্তি দেয়া হবে না। (আত তা'যীম ওয়াল মিন্নাহ, পৃষ্ঠা ৩৪)।

ইমাম যুরকানী রাহিমাহুল্লাহ (ওফাত ১১২২ হিজরি) উল্লিখিত হাদীসের আলোচনায় বলেন-

انه منسوخ بالآيات والأحاديث الواردة في اهل الفترة، واراد بابيه عمه ....، لان العرب تسمى العم اباً حقيقةً، او انه خبر احد فلا يعارض القاطع، ونص وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا.

"কুরআনুল কারীমের আয়াত এবং আহলে ফিতরাতের (হুকুম সম্পর্কিত) হাদীস দ্বারা উপরোল্লিখিত হাদীসটি মানসূখ বা রহিত করা হয়েছে। আর হাদীসে বর্ণিত পিতা শব্দ দ্বারা চাচাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা আরবে প্রচলিত রয়েছে যে, তারা চাচাকে পিতা বলে সম্বোধন করে থাকে। অথবা এ হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ, যা অকাট্য দলীলের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আর সে অকাট্য দলীল হলো (সেই আয়াত যেখানে বলা হয়েছে) আর কোন রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি কাউকে শাস্তি প্রদান করি না"। [সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ১৫।] (শারহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৩৬)।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা-মাতা যে নাজাতপ্রাপ্ত এ বিষয়ে যুগে যুগে আরবী ভাষায় লিখিত ছোট বড় বিয়াল্লিশটি কিতাব পাওয়া যায়। এসব কিতাব দুষ্প্রাপ্য নয়। তাই এ বিষয়ে সন্দেহ নিরসনে কিতাবগুলো পড়া উলামায়ে কিরামের কর্তব্য।

খ) অন্যদের জীবিত করা

ইমাম বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি *দালাইলুন নুবুওয়াহ* কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে

ইসলামের দাওয়াত দিলেন। লোকটি বললো, আপনি আমার মৃত মেয়েকে জীবিত না করা পর্যন্ত আমি ঈমান আনবো না। তখনই নবীজি মৃত মেয়েকে 'হে অমুক' বলে ডাক দিলেন। মেয়েটি *লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা* বলে জবাব দিলো। নবীজি বললেন, তুমি কি পৃথিবীতে ফিরে আসতে পছন্দ করো? মেয়েটি বললো, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আল্লাহর কসম! পিতা-মাতার চেয়ে আল্লাহর সান্নিধ্য আমার জন্য ভাল। দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতই আমার জন্য উত্তম।

ইমাম কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি *আশশিফা* কিতাবে হযরত হাসান বাসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আরজ করলো, তার মেয়ে উপত্যকার মধ্যে প্রোথিত রয়েছে। নবীজি লোকটির সাথে উপত্যকার মধ্যে গিয়ে মেয়েটির নাম ধরে 'হে অমুক' বলে ডাক দিয়ে বললেন, আল্লাহর হুকুমে জীবিত হয়ে যাও। তখনই মেয়েটি উঠে *লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা* বলে জবাব দিলো। নবীজি মেয়েটিকে বললেন, তোমার মাতা-পিতা মুসলমান হয়েছে। তুমি চাইলে তাদের কাছে তোমাকে ফিরিয়ে দেই। মেয়েটি বললো, প্রয়োজন নেই। কেননা তাদের চেয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যই আমার জন্য ভালো।

৪. রোগীকে সুস্থ করা, অভ্যাস ও গুণ পরিবর্তন বিষয়ক মু'জিযা

এ জাতীয় মু'জিযার সংখ্যা অগণিত। হাদীস এবং সিয়ারের কিতাবাদিতে তা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে।

৫. জড় জিনিসের কথা বলা এবং বৃক্ষরাজির সালাম পেশ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জড় জিনিস কথা বলতো। নবুওয়াতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে ও পরে *আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ* বলে বৃক্ষরাজি তাঁকে সালাম পেশ করতো। এছাড়া জড় জিনিস এবং পশুরা তাঁকে সালাম করতো। ইমাম তাজুদ্দীন সুবুকী বলেন, শুকনো খেজুর গাছের টুকরার ক্রন্দন বিষয়ক বর্ণিত হাদীস পুরোদস্তুর মুতাওয়াতির তথা অকাট্য সূত্রে বর্ণিত। কেননা এ হাদীস বিশজন সাহাবী থেকে বিভিন্ন সাহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

৬. ইশারায় মূর্তি উপুড় হয়ে পড়া

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, কা'বা ঘরের দেয়ালের পাথরের সাথে পা বাঁধা অবস্থায় তিনশত ষাটটি মূর্তি রাখা ছিলো। মক্কা

বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতে থাকা ছড়ি দিয়ে মূর্তিগুলোর দিকে ইশারা করে তিলাওয়াত করলেন-

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا.

"সত্য সমাগত আর মিথ্যা বিদূরিত, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবেই" (সূরাঃ বনি ইসরাঈল, আয়াত ৮১)।

এরূপ যে মূর্তির দিকেই ইশারা করেছেন তা উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে।

৭. খন্দকের পাথর ভাঙ্গা

খন্দক যুদ্ধের সময় পরিখা খননকালে একটি পাথর পাওয়া গেলো, যা সাহাবীদের কেউ ভাঙ্গতে পারছেন না। কিন্তু নবীজি সহজেই তা চুরমার করে দিলেন। বিষয়টি ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

৮. পাথরের গায়ে নবীজির কদম মুবারকের চিহ্ন

আল্লামা শিহাব খাফফাজী ইমাম কাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহির *আশশিফা* কিতাবের জগৎখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ *নাসীমুর রিয়াদ* এ বলেন, কোন কোন সময় চলার পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কদম মুবারক পাথরের বুকে দেবে যেতো। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন পাথরের বুকে তাঁর মুবারক কদমের চিহ্ন অবশিষ্ট আছে। নবী প্রেমিকগণ ভক্তি সহকারে এগুলোর যিয়ারত করে এবং তা থেকে বরকত হাসিল করে।

ইমাম কাসতাল্লানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি *মাওয়াহিবে লাদুনিয়্যা* কিতাবেও বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

৯. গায়েবের খবর প্রদান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতীত ও ভবিষ্যতের প্রচুর গাইব এর খবর (অদৃশ্যের সংবাদ) প্রদান করেছেন। হাদীস ও সিয়ারের কিতাবসমূহে এসবের বর্ণনা বিপুলভাবে উল্লিখিত আছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, সায়্যিদুনা উমার ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم ، حفظ ذٰلك من حفظ ونسيه من نسية.

"একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে (সব কিছু) জানালেন,

এমনকি জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশ, জাহান্নামীদের জাহান্নামে প্রবেশ এবং তাদের অবস্থাদি অবহিত করলেন। (আমাদের মধ্যে) যে পেরেছে তা মনে রেখেছে, যে পারেনি ভুলে গেছে” (সহীহ বুখারী, কিতাবু বাদয়িল খালক, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬২৫, হাদীস নং ৩২২৭)।

উল্লেখ্য যে, ইলমে গায়েব সম্পর্কে এখানে কিছু কথা বলা দরকার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলমে গায়েব যেমন অস্বীকার করার সুযোগ নেই, তেমনি এই ইলমকে আল্লাহর ইলমের সাথে তুলনা করা কিংবা সত্তাগত ইলম মনে করা মোটেও ঠিক নয়। কারণ ইলমে গায়েব দুই প্রকার: (ক) ইলমে জাতি মুতলাক, (খ) ইলমে আতায়ী মুকতাসাব।

ইলমে জাতি মুতলাক সব ধরনের ইলমকে অন্তর্ভুক্ত করে। তা আল্লাহর সত্তাগত ইলম। এতে মাখলুকের কোন অংশ নেই।

ইলমে আতায়ী মুকতাসাব হলো এমন ইলমে গায়েব যা আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে কাউকে দেয়া হয়ে থাকে। কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে-

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ أَحَدًا . إِلاَّ مَنِ ارْتَضٰى مِن رَّسُوْلٍ.

“আল্লাহই একমাত্র ইলমে গায়েবের অধিকারী। এই ইলমে গায়েব তিনি তাঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া কাউকে অবহিত করেন না” (সূরা জিন, আয়াত ২৬-২৭)।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলমে গায়েব হলো ইলমে আতায়ী মুকতাসাব (আল্লাহ প্রদত্ত, স্ব-অর্জিত নয়)।

১০. আঙ্গুল মুবারকের ফাঁক থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আঙ্গুল মুবারকের ফাঁক থেকে বিভিন্ন সময়ে পানি প্রবাহিত হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁর আঙ্গুল মুবারকের ফাঁক থেকে পানি প্রবাহিত হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এসব ঘটনা এত বিপুল সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যা অকাট্য প্রমাণিত।

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনামতে, হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন সাহাবায়ে কিরাম পানির পিপাসায় অস্থির হয়ে পড়লেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একটি পাত্রে সামান্য পানি ছিল। তিনি এই পানি দ্বারা উযু করছিলেন। তাঁরা দ্রুত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, আমাদের প্রয়োজনের জন্য এতটুকু পানিই ছিল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের মধ্যে

পবিত্র হাত রাখলেন। দেখা গেল তাঁর আঙ্গুলসমূহের মধ্য হতে পানির ঝর্না প্রবাহিত হচ্ছে। প্রায় দেড় হাজার সাহাবী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সবাই ঐ পাত্রের পানি দিয়ে উযু করলেন এবং পেট ভরে পানি পান করলেন" (শারহুশ শিফা, ইমাম মোল্লা আলী কারী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৯৯)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পোশাক পরিচ্ছদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় পোশাক ছিলো তাঁর *কামীস* অর্থ্যাৎ জামা, যার আস্তিন হাতের কব্জি অবধি প্রলম্বিত থাকতো। এছাড়া তিনি জুব্বাও পরতেন। তাঁর পরনের চাদর ছিলো সাড়ে ছয় গজ লম্বা। লুঙ্গি দৈর্ঘ্যে সাড়ে চার হাত এবং প্রস্থে আড়াই হাত ছিলো। তিনি পাজামা ক্রয় করেছিলেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পরিধান করার জন্য তিনি তা ক্রয় করেছিলেন। সাহাবাগণ তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে পাজামা পরিধান করতেন। তিনি মোজা ও চপ্পল পরিধান করতেন। আংটিও পরিধান করতেন। তাঁর পোশাকের প্রিয় রঙ ছিলো সাদা। তবে প্রয়োজনে অন্যান্য রঙের পরিধেয় ব্যবহার করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকটি পাগড়ি ছিলো। সাধারণত তিনি পাগড়ির নীচে টুপি পরতেন। তবে কোন কোন সময় টুপি ছাড়াই পাগড়ি পরতেন। আবার কখনো পাগড়ি ছাড়া কেবল টুপি পরতেন। আর যখন পাগড়ি পরতেন তখন দুই কাঁধের মধ্যখানে *শামলা* ঝুলিয়ে রাখতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুদ্ধাস্ত্রসমূহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নয়খানা তলোয়ার, চার কিংবা পাঁচটি বর্শা, সাতটি বর্ম, ছয়টি ধনুক ও শিরস্ত্রাণ ছিলো দুটি। তন্মধ্যে একটি লৌহনির্মিত। দুটি ঢাল ছিলো। সেই সাথে কালো, হলুদ এবং সাদা রঙের কয়েকটি পতাকা ছিলো। পতাকাগুলো যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হতো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গৃহপালিত পশু

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাত কিংবা দশটি ঘোড়া ছিলো। খচ্চর ছিলো চারটি। তন্মধ্যে একটি সম্রাট মুকাওকিস হাদিয়া দিয়েছিলেন, এটির নাম ছিলো *দুলদুল*। দুইটি গাধা ছিলো। একটির নাম *উফায়রা'* অপরটির নাম *ইয়াফুরা*। এ ছাড়াও বিশটি দুধের উট ছিলো। এ উটগুলোর দুধ ছিলো নবী পরিবারের প্রধান খাদ্য। তাছাড়া সাতটি বকরিও ছিলো।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত

একাদশ হিজরির সফর মাসের শেষদিকে একদা নবীজি সাহাবীদের সাথে নিয়ে উহুদ পর্বতে তাশরিফ নিলেন। শহীদগণের জন্য দোয়া করলেন। এরপর মসজিদে নববীতে ফিরে এসে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করলেন। এক পর্যায়ে ইরশাদ করলেন, *আমি তোমাদের থেকে আগে চলে যাচ্ছি, তোমাদের সাক্ষীস্বরূপ থাকবো* (দীর্ঘ হাদীসের একাংশ)। এ রাতেই জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে কবরবাসীর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করলেন। ঊনত্রিশ সফর সোমবার রাতে জান্নাতুল বাকীতে একটি জানাযায় শরীক হলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে মাথা মুবারকে ব্যথা অনুভব করতে লাগলেন। সেই সাথে প্রচণ্ড জ্বর এলো। এগারো দিন পর্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় নামাযে ইমামতি করলেন। সর্বমোট তেরো কিংবা চৌদ্দ দিন অসুস্থ ছিলেন। দুনিয়ার জীবনের শেষ এক সপ্তাহ পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণের সম্মতি নিয়ে হযরত আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে অবস্থান করেন।

ওফাতের পাঁচদিন পূর্বে বুধবার কিছুটা সুস্থতাবোধ করলে মসজিদে তাশরিফ নেন। অতঃপর মিম্বরে বসে (এটি ছিলো মিম্বর শরীফে শেষ বসা) হামদ ও ছানার পর ইরশাদ করলেন, *আল্লাহ ইয়াহুদী ও নাসারা জাতিকে ধ্বংস করুন। তারা তাদের নবীগণের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। তোমরা আমার কবরকে সিজদার জায়গায় পরিণত করো না*। এরপর মিম্বর থেকে নেমে যোহরের নামায আদায় করলেন। নামাযশেষে আবারো মিম্বরে বসে আনসারগণের ব্যাপারে ওসিয়ত করে ইরশাদ করলেন, *আল্লাহ তাঁর একজন বান্দাকে এখতিয়ার দিয়েছিলেন, সে যেনো তাঁর ইচ্ছামতো দুনিয়ার সৌন্দর্যের যা কিছু গ্রহণ করতে চায় তা গ্রহণ করে কিংবা আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তা গ্রহণ করে। সে বান্দা দ্বিতীয়টি গ্রহণ করেছে*। আবূ সাঈদা (রা) বলেন, এতদশ্রবণে হযরত আবূ বাক্র রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে শুরু করলেন এবং বললেন, *আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোন*।

বৃহস্পতিবার তিনটি ওসিয়ত করলেন। প্রথমটি ইয়াহুদী নাসারাকে বহিষ্কার বিষয়ে। দ্বিতীয়টি প্রস্তুতকৃত সৈন্যদল প্রেরণ সংক্রান্ত। আর তৃতীয়টি বর্ণনাকারী ভুলে গেছেন।

সেদিন মাগরিবের নামাযে ইমামতি করেছেন। এশার সময় রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। জানতে চাইলেন, লোকজন কি নামায পড়ে নিয়েছে? হযরত আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায হয়নি, সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তখনই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর একটু স্বস্তিবোধ করলেন।

আবারো জানতে চাইলেন, লোকজন কি নামায পড়ে নিয়েছে? এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারে একই ঘটনা ঘটলো (অর্থাৎ তিনবারই মূর্ছা গেলেন)। এরপর হযরত আবূ বাক্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নামাযে ইমামতি করার নির্দেশ পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় হযরত আবূ বাক্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহু সতেরো ওয়াক্ত নামাযে ইমামতি করেছেন। বৃহস্পতিবার ইশার নামায এবং সোমবার ফজরের নামায, এর মধ্যবর্তী সময়ের পনেরো ওয়াক্তের নামায।

ওফাতের এক বা দুই দিন পূর্বে (শনি কিংবা রবিবার) একটু সুস্থতাবোধ করলেন। তখন দুইজনের কাঁধে ভর করে মসজিদে তাশরিফ নিলেন। হযরত আবূ বাক্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহু যোহরের নামাযে ইমামতি করছিলেন। নবীজি তাশরিফ আনছেন দেখে হযরত আবূ বাক্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহু ইমামের স্থান ছেড়ে পিছিয়ে যেতে শুরু করলেন। নবীজি তাঁকে বিরত রাখলেন। নির্দেশ দিলেন, তাঁকে যেনো আবু বাকরের পাশে বসানো হয়। তাঁকে আবু বাক্‌র এর বাম পাশে বসানো হয়। তখন আবূ বাক্‌র নবীজির ইকতিদা করলেন এবং মুকাব্বির হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেন। ওফাতের আগের দিন রবিবার দুইজন দাসকে আযাদ করে দেন। এছাড়া তাঁর কাছে গচ্ছিত ছয় অথবা সাত দীনার সাদাকা করে দেন। তাঁর নিজস্ব অস্ত্রগুলো মুসলমানদেরকে দিয়ে দেন। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, সোমবার দিন ফজরের নামাযে আবূ বাক্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহু ইমামতি করছেন। সাহাবাগণ কাতারবন্দি অবস্থায় নামাযরত। এ সময় হযরত আইশার হুজরার পর্দা সরিয়ে নবীজি নামাযরত সাহাবাগণের দিকে তাকিয়ে খুশিতে মুচকি হাসলেন। হযরত আবূ বাক্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বস্থান ছেড়ে সরে আসতে লাগলেন, মনে করলেন হয়তো বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ আনছেন। তখন নবীজি হাত মুবারক দিয়ে ইশারা করে তাঁদেরকে নামায পূর্ণ করে নিতে বললেন। এরপর হুজরা শরীফের পর্দা ছেড়ে দিলেন।

দুপুরের দিকে হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে খবর দিয়ে এনে চুপি চুপি কী যেনো বললেন। এরপর হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে ডেকে এনে তাঁদেরকে চুমো দিলেন এবং তাঁদের সাথে ভালো ব্যবহারের ওসিয়ত করলেন। তারপর উম্মুল মুমিনীনগণকে ডেকে এনে বিশেষ উপদেশ প্রদান করেন। এছাড়া সাহাবাগণকে গুরুত্বের সাথে নামায আদায় এবং নিজ নিজ দাসীগণের সাথে সদয় ব্যবহারের বিশেষ উপদেশ প্রদান করেন। এ সময় হযরত আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবূ বাক্‌র সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজরা

শরীফে ঢুকলেন। তাঁর হাতে মিসওয়াক ছিলো। হযরত আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা লক্ষ করলেন, নবীজি মিসওয়াকের দিকে তাকিয়ে আছেন। কেননা তিনি মিসওয়াক খুবই পছন্দ করতেন। আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জানতে চাইলেন যে, নবীজি মিসওয়াক চাচ্ছেন কি না। তখন নবীজি ইশারায় মিসওয়াক দেয়ার জন্য বললেন। হযরত আইশা চিবিয়ে নরম করে মিসওয়াক এগিয়ে দিলেন। তখন তিনি চোখ মুবারক মুদে নিলেন। ঠোঁট মুবারক নড়ছে দেখে হযরত আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবীজির মুখ মুবারকের কাছে কান পেতে শুনলেন, বলছেন- *হে আল্লাহ! আমাকে তোমার নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাগণ, নবীগণ, শহীদগণ এবং নেককারদের সাথী বানাও। হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা করো এবং আমাকে পরম বন্ধুর সান্নিধ্য দান করো*। শেষ বাক্যটি বারবার উচ্চারণ করছিলেন।

একাদশ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার দিন দুপুরের পর নবীজি ইন্তিকাল করেন। সেদিন তাঁর বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন যে, হুজুরের বয়স যখন চল্লিশ বছর ছিলো, তখন তাঁর উপর সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়। এরপর তিনি তেরো বছর মক্কা শরীফে অবস্থান করেন। এ সময় আল্লাহপাক তাঁকে হিজরতের নির্দেশ দিলে তিনি মদীনা শরীফে হিজরত করেন। এখানে তিনি দশ বছর অতিবাহিত করার পর ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো তেষট্টি বছর (বুখারী)।

ফায়দা ২০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোসল করান সায়্যিদুনা আলী এবং সায়্যিদুনা আব্বাস এবং তাঁর দুই পুত্র ফাদাল ও কাছাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম। উসামা ও শাকরান নামক দুইজন আযাদকৃত দাস, আওস ইব্‌ন খাওলী নামক একজন আনসার তাঁদেরকে সহযোগিতা করেন।

সেলাইবিহীন তিন টুকরা সাদা কাপড় দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফন দেয়া হয়। জানাযায় কেউ ইমাম ছিলেন না, বরং প্রত্যেক সাহাবী একা একা জানাযা পড়েন। উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদা আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হুজরা শরীফে নবীজিকে দাফন করা হয়।


নবী জীবনের
সনওয়ারী বিশেষ ঘটনাবলী

জন্ম থেকে নবুওয়াতের প্রকাশ পর্যন্ত

১ম বর্ষ

হযরত হালিমা সা'দিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা মক্কা শরীফে এসে শিশু নবীকে তাঁর ঘরে নিয়ে যান।

২য় বর্ষ

এ বছর হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন।

৩য় বর্ষ

এ বছর নবীজির প্রথম বক্ষ বিদারণ হয়।

৪র্থ বর্ষ

অন্য বর্ণনামতে প্রথম বক্ষ বিদারণের ঘটনা চতুর্থ বছরে সংঘটিত হয়।

৫ম বর্ষ

হযরত হালিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা শিশু নবীকে তাঁর মায়ের কাছে ফেরত দেন।

৬ষ্ঠ বর্ষ

এ বছর শিশু নবীকে নিয়ে তাঁর মা মদীনা শরীফে বেড়াতে যান। মদীনা শরীফের বনি নাজ্জার গোত্র নবীজির দাদা হযরত আবদুল মুত্তালিবের নানা বাড়ি। আত্মীয়তার এ সম্পর্ক সব সময়ই প্রগাঢ় ছিলো। মদীনা শরীফে কিছু দিন অবস্থানের পর মক্কা শরীফে ফেরার পথে *আল-আবওয়া* নামক স্থানে নবীজির মা হযরত আমেনা ইন্তিকাল করেন এবং অদ্যাবধি এখানে তাঁর কবর বিদ্যমান আছে। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীদের নিয়ে তাঁর কবর যিয়ারত করতে যান এবং করুণভাবে কাঁদেন। ফলে সাথের সাহাবীগণও কাঁদেন (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানাইয)।

৮ম বর্ষ

এ বছর নবীজির দাদা হযরত আবদুল মুত্তালিবের ইন্তিকাল হয়। তাঁর বয়স তখন ১২০ বছর এবং নবী করীম (সা.)-এর বয়স আট বছর। তখন থেকে নবীজির প্রতিপালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তাঁর চাচা হযরত আবূ তালিব (সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ.,পৃ. ৯১)।

১২তম বর্ষ

এ বছর নবীজি তাঁর চাচা হযরত আবূ তালিবের সাথে বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গী হয়ে সর্বপ্রথম সিরিয়া সফর করেন। কাফেলাটি সিরিয়ার *বুসরা* নামক স্থানে পৌঁছলে খ্রিস্টান ধর্মজাযক *বুহায়রা* বালক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আখেরী নবী হিসেবে শনাক্ত করেন। *বুহায়রা* আবু তালিবকে উপদেশ দিলেন এ বালককে নিয়ে শীঘ্রই যেনো মক্কা শরীফে ফিরে যান। কেননা ইহুদীরা তাঁকে দেখতে পেলে সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।

১৩তম বর্ষ

এ বছর হযরত উমার ইব্‌ন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন।

১৪তম বর্ষ

এ বছর মক্কা শরীফের *বনি কিনানা* ও *বনি কায়েস* গোত্রদ্বয়ের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতিহাসে এ যুদ্ধ *হারবুল ফিজার* নামে খ্যাত। নবীজি এ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে নরহত্যার বিভৎসতা অবলোকন করেন। এ বছরই *হিলফুল ফুযুল* নামক চুক্তি সম্পাদিত হয়। কুরাইশ গোত্র এ মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, তারা সব ধরনের যুলুম উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করবেন।

২৫তম বর্ষ

এ বছর নবীজি হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বাণিজ্য কাফেলার দায়িত্ব নিয়ে সিরিয়ায় বাণিজ্যিক সফর করেন। সফরকালে হযরত খাদীজার বিশ্বস্ত দাস মাইসারা নবীজির সাথে ছিলেন। বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে মক্কা শরীফে সফল প্রত্যাবর্তনের দুই মাস পর নবীজি হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করেন।

৩০তম বর্ষ

এ বছর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন।

৩৪তম বর্ষ

এ বছর হযরত মুআবিয়া ও হযরত মুআয ইব্‌ন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুমা জন্মগ্রহণ করেন।

৩৫তম বর্ষ

এ বছর হযরত ফাতিমাতুয যাহরা রাদিয়াল্লাহু আনহা জন্মগ্রহণ করেন। কুরাইশগণ কা'বা গৃহের পুরাতন স্থাপনা ভেঙ্গে নতুন করে তৈরি করেন। কা'বা শরীফ নির্মাণের কাজ শেষ হলে *হাজরে আসওয়াদ* স্বস্থানে প্রতিস্থাপন নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব নবীজির উপর অর্পিত হলে তিনি নিজ হাতে পবিত্র পাথর স্বস্থানে স্থাপন করে এ বিরোধের সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান করে দেন।

৩৯তম বর্ষ

এ বছর নবুওয়াত প্রকাশের সূচনা হিসেবে বেশ কিছু অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে রয়েছে নবীজি অনন্ত আকাশে নূর প্রজ্জ্বলিত হতে দেখতেন, অলৌকিক আওয়াজ শুনতেন অথচ কাউকে দেখতেন না। এ সময় নবীজি হেরা পর্বতের গুহায় একাকী বসে ধ্যানমগ্ন হতে শুরু করেন। মতান্তরে হযরত ফাতিমা (রা.) এবছর জন্মগ্রহণ করেন।

৪০তম বর্ষ

হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় অবস্থানকালে প্রথমবারের মতো ওহী নিয়ে আসেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম।

নবুওয়াতের প্রকাশ থেকে হিজরত পর্যন্ত

নবুওয়াতের ১ম বর্ষ

এ বছর হযরত খাদীজা, হযরত আলী, হযরত যায়েদ ও হযরত আবূ বাক্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহুম ইসলাম গ্রহণ করেন।

৩য় বর্ষ

এ বছর প্রকাশ্য ইসলামের দাওয়াত দেয়ার হুকুম নাযিল হয়। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন-

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ

"অতএব আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা করুন" (সূরা হিজর, আয়াত ৯৪)।

৫ম বর্ষ

এ বছর হযরত আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা জন্মগ্রহণ করেন।

এ বছরই মুসলমানগণ প্রথম হাবশা বা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। প্রথম হিজরতকারী ছিলেন এগারোজন পুরুষ ও চারজন মহিলা। তন্মধ্যে ছিলেন হযরত উসমান ইব্‌ন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী নবীজির প্রিয়তমা কন্যা হযরত রুকায়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা, যিনি পরবর্তীতে উম্মুল মুমিনীন হন। পরবর্তীতে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন হযরত জাফর ইব্‌ন আবূ তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ ৮২ জন পুরুষ (নারী ও শিশু ছাড়া)। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী হিজরতকারী সাহাবীগণকে সম্মান প্রদর্শন করেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীগণের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক মক্কায় ফিরে আসেন। বাকীরা সেখানে অবস্থান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফে হিজরত করার পর তাঁরাও আবিসিনিয়া ত্যাগ করে তথায় চলে যান। এ বছরই মক্কার কাফিরদের হাতে হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর মা হযরত সুমাইয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা শহীদ হন। তিনিই হচ্ছেন ইসলামের প্রথম শহীদ।

৬ষ্ঠ বর্ষ

এ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীজির দোয়ার বরকতে হযরত হামযার তিন দিন পর হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুও ইসলাম গ্রহণ করেন।

৭ম বর্ষ

এ বছর কুরাইশগণ এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো যে, তারা বনি হাশিম ও বনি মুত্তালিবের সাথে সব ধরনের লেনদেন, বিয়ে-শাদী ইত্যাদির সম্পর্ক ছিন্ন করবে। কুরাইশগণ মনসূর ইব্‌ন ইকরামা নামক ব্যক্তিকে দিয়ে একটি অঙ্গীকারনামা লিখিয়ে নেয়। পরবর্তীতে মনসূরের হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল। সম্পর্ক ছিন্নের এই অঙ্গীকারনামা তারা কা'বা শরীফের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে। এই কঠিন অবস্থায় বনি হাশিম ও বনি মুত্তালিব *শি'বে আবু তালিব* নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই অবরোধ অবস্থা তিন বছর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। পরবর্তীতে কুরাইশের পাঁচজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অবরোধ প্রত্যাহৃত করতে একমত হন। এ বছরই মদীনা শরীফের আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৮ম বর্ষ

এ বছর পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মক্কার মুশরিকরা মনেপ্রাণে কামনা করতো যেনো পারস্যের মুশরিকরা বিজয়ী হয়। আর মুসলমানগণ কামনা করতেন যেনো *আহলে কিতাব* (খ্রীস্টান) রোমানরা বিজয়ী হয়। কিন্তু এ যুদ্ধে রোমানরা পরাজিত হয়।

৯ম বর্ষ

কুরাইশদের অবরোধ প্রত্যাহার হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবার পরিজনসহ *শি'বে আবূ তালিব* থেকে বেরিয়ে আসেন। এ

বছরই চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মু'জিযা সংঘটিত হয়।

১০ম বর্ষ

এ বছর প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালিব ইন্তিকাল করেন। হযরত আবূ তালিবের তিন দিন পর হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইন্তিকাল করেন। এ শোকাবহ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই মর্মাহত হন। এ কারণেই এ বছরকে *আমুল হুয্‌ন* (দুশ্চিন্তার

বছর) বলে অভিহিত করা হয়। এ বছরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাওদা বিনতে জামআ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করেন এবং এ বছরই হযরত আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আক্দ সম্পন্ন হয়। এ বছরই নবীজি তায়েফবাসীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে তথায় গমন করেন। সেখানে তিনি একমাস সময় অবস্থান করে দাওয়াতি কাজ অব্যাহত রাখেন। কিন্তু তায়েফবাসী দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁকে নির্মমভাবে নির্যাতন করে সেখান থেকে বের করে দেয়।

১১তম বর্ষ

মিনা, আরাফাত এবং অন্যান্য বিখ্যাত স্থানগুলোতে বিভিন্ন মৌসুমে আগত মানুষদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে নবীজি আত্মনিয়োগ করেন। এ বছরই আনসারগণের ইসলাম গ্রহণের সূচনা হয়। মদীনা শরীফের খাযরাজ গোত্রের ছয় ব্যক্তি মিনার সন্নিকটে *আকাবা* নামক স্থানে নবীজির সাথে সাক্ষাতপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করেন।

এ বছরই সিরিয়ার *নাসিবীন* নামক শহরবাসী নয়জন জিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করে। এ নয়জন জিনের ইসলাম গ্রহণের কথা পবিত্র কুরআন শরীফে এভাবে উল্লিখিত রয়েছে-

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا أَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلٰى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِيْنَ.

"যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কুরআন পাঠ শুনছিল। তারা যখন তার নিকট (কুরআন পাঠের জায়গায়) উপস্থিত হল তখন পরস্পর বলল, চুপ থাক। অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হল তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল" (সূরা আহকাফ, আয়াত ২৯)।

এ বছরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজে গমন করেন। মি'রাজ রজনীতেই আল্লাহপাক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন।

১২তম বর্ষ

এ বছরই আকাবার প্রথম বাইআত অনুষ্ঠিত হয়। মদীনার বারোজন আনসার আকাবা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইআত হন।

১৩তম বর্ষ

এ বছরই ইতিহাসখ্যাত আকাবার দ্বিতীয় বাইআত অনুষ্ঠিত হয়। মূলত এটা আনসারগণের তৃতীয় সাক্ষাত ছিলো। এবারে মদীনা শরীফের বিখ্যাত আওস ও খাযরাজ গোত্রের ৭৩জন পুরুষ ও ২জন মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সাথে আকাবা নামক স্থানে সাক্ষাৎ করে বাইআত করেন। নবীজি তাঁদের মধ্য থেকে বারোজন নাকীব (নেতা) মনোনীত করেন।

হিজরত থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত

প্রথম হিজরি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফ হিজরত করেন। এ সময় তাঁর বয়স তিপ্পান্ন বছর হয়েছিল। বারো রবিউল আউয়াল সোমবার দুপুরে নবীজি মদীনা শরীফে প্রবেশ করেন। এ বছরই আনসার ও মুহাজির সাহাবাগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করা হয়। মসজিদে কুবা এবং মসজিদে নববীও প্রতিষ্ঠা হয় এ বছরই।

কুবা থেকে মদীনা নগরীতে প্রবেশের দিন *ওয়াদিয়ে বনি সালিমা* বা বনি সালিম উপত্যকায় নবীজি প্রথম জুমুআর নামায আদায় করেন। এ বছরই আযানের সূচনা হয়। এ বছর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আশূরার রোযা রাখেন এবং সাহাবাগণকেও আশূরার রোযা রাখার নির্দেশ দেন।

মদীনা শরীফের বাসিন্দা ইয়াহূদী এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সাথে নবীজি শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের চুক্তি সম্পাদন করেন। ইতিহাসে এ চুক্তি *মীছাকে মদীনা* বা মদীনা সনদ নামে খ্যাত।

দ্বিতীয় হিজরি

এ বছরের শা‘বান মাসের মধ্যভাগে বাইতুল মাকদিস থেকে কা‘বা শরীফের দিকে কিবলা পরিবর্তিত হয়। এ বছরই রামাদানের রোযা ফরয হয়, যাকাত ফরয করা হয় এবং ফিতরা ওয়াজিব হয়। এ বছর থেকে ইসলামী শরীয়তে ঈদ প্রবর্তিত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রথম গাযওয়া সংঘটিত হয়। এই গাযওয়ার নাম *গাযওয়ায়ে ওয়াদ্দান*, অপর নাম *গাযওয়ায়ে আবওয়া*। আবওয়া হচ্ছে মক্কা ও মদীনা শরীফের মধ্যবর্তী স্থানের একটি পাহাড়ের নাম। এ গাযওয়ায় সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। এ ছাড়া *গাযওয়ায়ে বাওয়াত*, *গাযওয়ায়ে যাতুল উশায়রাহ* ও *গাযওয়ায়ে বদর আল উলা* সংঘটিত হয়। এ বছর রামাদান মাসের ষোল তারিখে সংঘটিত হয় ইতিহাসখ্যাত বদরযুদ্ধ। মুসলমানগণ প্রথমবারের মতো সম্মিলিতভাবে জান বাজি রেখে যুদ্ধ করে মক্কার মুশরিকদের উপর বিজয়ী হন। এ যুদ্ধে চৌদ্দজন সাহাবী শহীদ হন। সত্তরজন

কাফির সৈন্য নিহত ও সত্তরজন বন্দি হয়। এ বছরে সংঘটিত অন্যান্য গাযওয়াগুলো হলো- *গাযওয়ায়ে বনি সালিম* অপর নাম *গাযওয়ায়ে কারকারাতুল কিদ্‌র, গাযওয়ায়ে বনু কাইনুকা, গাযওয়া যাতুস-সাবীক* এবং *গাযওয়ায়ে গাতাফান*।

এ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় কন্যা হযরত রুকায়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইন্তিকাল করেন। এ ছাড়া হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে নবীকন্যা হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে হয়।

এ বছরের শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। হযরত উসমান ইব্‌ন মাযউন রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বছর ইন্তিকাল করেন। তিনি হলেন মুহাজিরগণের মধ্যে প্রথম ইন্তিকালকারী সাহাবী। জান্নাতুল বাকীতে মুসলমানগণের মধ্যে প্রথম দাফন করা হয় হযরত উসমান ইব্‌ন মাযঊন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে।

এ বছর হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়ির রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হলেন মদীনা শরীফে জন্মগ্রহণকারী প্রথম মুহাজির সন্তান।

তৃতীয় হিজরি

এ বছর রামাদান মাসে হযরত হাসান ইব্‌ন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন।

এ বছরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাফসা ও হযরত যয়নব বিনতে খুযায়মা রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করেন। এ বছর হযরত উসমান ইব্‌ন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীকন্যা হযরত উম্মে কুলছূম রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করেন। এ বছরের মধ্য শাওয়াল শনিবার ঐতিহাসিক উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দান্দান (দাঁত) মুবারক শহীদ হয়। এ ছাড়া তাঁর নীচের ঠোঁট ও গাল মুবারকে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এ যুদ্ধে মুসলমানগণের সত্তরজন শহীদ হন। তন্মধ্যে প্রধান হলেন নবীজির প্রিয় চাচা সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু। এ

বছর সংঘটিত অন্যান্য গাযওয়াগুলো হলো- *গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ, গাযওয়ায়ে বদরে সুগরা*।

চতুর্থ হিজরি

এ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্তরজন সাহাবীকে *বি'রে মাউনায়* প্রেরণ করেন। এরা সবাই ছিলেন হাফিযে কুরআন (বিশেষজ্ঞ) সাহাবী। এই সত্তরজন সম্মানিত সাহাবী বি'রে মাউনায় পৌঁছলে সেখানকার *সুলায়িম,*

উসায়া, *রি'ল* এবং *যাকওয়ান* নামক গোত্র চতুষ্টয় বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক তাঁদেরকে শহীদ করে। এ হৃদয়বিদারক সংবাদ জানার পর নবীজি ত্রিশদিন পর্যন্ত এই বিশ্বাসঘাতকদের জন্য ফজরের নামাযে কুনূতে নাযেলা পড়ে বদদোয়া করেন।

এ বছর হযরত আসিম ইব্‌ন ছাবিত রাদিআল্লাহ আনহুর নেতৃত্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সারিয়া প্রেরণ করেন। এ সারিয়ার নাম *সারিয়ায়ে আসিম ইব্‌ন ছাবিত*। দশজন নেতৃস্থানীয় সাহাবী এই সারিয়ায় অংশ নেন। *মায়ে রাজী'* নামক স্থানে পৌঁছার পর *বনু লিহয়ান* গোত্র তাঁদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। হযরত আসিম ইব্‌ন ছাবিত রাদিআল্লাহ আনহু এবং অন্য সাতজনকে তারা শহীদ করে ফেলে। এই সাতজনের অন্যতম হচ্ছেন হযরত খুবাইব ইব্‌ন আদী রাদিআল্লাহ আনহু।

এ বছর *গাযওয়ায়ে বনু নাযীর* সংঘটিত হয়। বনু নাযীর ছিল মদীনা শরীফের একটি ইহুদী গোত্র। এ বছরই সায়্যিদা যয়নব বিনতে খুযায়মা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বছর সায়্যিদা উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করেন। সায়্যিদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মা হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ রাদিয়াল্লাহু আনহা ইন্তিকাল করেন। নবীজি তাঁর দাফনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সৌভাগ্যবতী হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ রাদিয়াল্লাহু আনহার কবর খনন করা হলে নবীজি তাঁর জন্য দোয়া করেন।

পঞ্চম হিজরি

এ বছর *গাযওয়ায়ে দূমাতুল জান্দাল* সংঘটিত হয়। এ স্থান হলো মদীনা শরীফ থেকে দামেশক যাওয়ার রাস্তায় পাঁচ দিনের পথ।

এ বছরের অন্যান্য গাযওয়াগুলো হলো- *গাযওয়ায়ে আহযাব* বা খন্দকের যুদ্ধ, *গাযওয়ায়ে বনি কুরাইযা* (বনি কুরাইযা ছিল মদীনা শরীফের একটি ইহুদী গোত্র), *গাযওয়ায়ে বনি মুসতালিক*।

গাযওয়ায়ে বনি মুসতালিকে মুসলমানগণ জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিছকে বন্দী করেন। নবীজি তাঁকে মুক্ত করেন এবং পত্নী হিসেবে গ্রহণ করেন। এ গাযওয়ায়

হযরত আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহার উপর অপবাদ আরোপের ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে দেখা যায়, হযরত আইশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে বদনাম রটানোতে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ছিলো। কয়েক দিনের মধ্যে হযরত আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যে নির্দোষ তা প্রমাণের জন্য আল্লাহপাক আয়াত নাযিল করেন।

গাযওয়ায়ে বনি মুসতালিকে তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। এ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যয়নব বিনতে জাহশ রাদিয়াল্লাহু

আনহাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করেন। পর্দার বিধান সম্বলিত আয়াত এ বছরই নাযিল হয়। এ বছর হযরত সা'দ ইব্‌ন মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালে আল্লাহ পাকের আরশ কেঁপে উঠেছিল।

ষষ্ঠ হিজরি

এ বছরের বিশেষ ঘটনা হলো হুদাইবিয়ার সন্ধি। হুদাইবিয়ায় সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বিশেষ বাইআত হয়েছিলেন, যা *বাইআতে রিদওয়ান* নামে খ্যাত। এই বাইআত সম্পর্কে আল্লাহপাক ঘোষণা করেন-

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا.

"আল্লাহ অবশ্যই সেসব মুমিনের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন যারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে বায়আত গ্রহণ করেছে। আর তাদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কেও তিনি (আল্লাহ) অবহিত। অতঃপর তাদের অন্তকরণে প্রশান্তি নাযিল করেছেন এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়" (সূরা ফাত্‌হ, আয়াত ১৮)।

এ বছর সূর্যগ্রহণের ঘটনা সংঘটিত হয়। সূর্যগ্রহণ চলাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম *সালাতুল কুসূফ* আদায় করেন।

এ বছর যিহারের হুকুম নাযিল হয়। আওস ইব্‌ন সামিত এবং তাঁর স্ত্রী খাওলা বিনতে মালিক এর মধ্যকার ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা মুজাদালা এর প্রথম দিকে যিহারের বিধান সম্বলিত নির্দেশ নাযিল হয়।

এ বছরে সংঘটিত অন্য গাযওয়া হলো- *গাযওয়ায়ে বনি লিহ্‌য়ান* ও *গাযওয়ায়ে যি করাদ* বা *গাযওয়াতুল গাবাহ*। এ বছর উরানার দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হয়। *উক্‌ল* ও *উরায়না* গোত্রের কিছু লোক মদীনা শরীফে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু মদীনা শরীফের আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল না হওয়ায় তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নির্দেশ দেন, তারা যেনো

শহরের বাইরে অবস্থিত সাদাকার উট পালে চলে যায় এবং সেখানে অবস্থান করে উটের দুধ এবং মূত্র পান করে। উটের দুধ ও মূত্র পানের ফলে কিছু দিনের মধ্যে তারা সুস্থ হয়ে উঠে। দুর্ভাগ্যবশত তারা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। ইত্যবসরে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিযুক্ত উটের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো লুণ্ঠন করে পালিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ধরিয়ে আনেন এবং শাস্তি প্রদান করেন। কতিপয় উলামার মতে এ বছরই হজ্জ ফরয হয়।

সপ্তম হিজরি

এ বছর *গাযওয়ায়ে খায়বার* সংঘটিত হয়। খায়বার হচ্ছে মদীনা শরীফ থেকে প্রায় একশ বিশ মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত একটি এলাকা।

গাযওয়ায়ে খায়বারে যয়নব বিনতে হারিছ নাম্নী ইহুদী মহিলা খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাওয়ার দাওয়াত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, *এই গোশ্তের টুকরা আমায় বলে দিয়েছে যে, এতে বিষ মিশ্রিত করা হয়েছে।* এই যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসেন হযরত যয়নব বিনতে হুয়াই, পরবর্তীতে নবীজি তাঁকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করেন।

এ যুদ্ধের এক রাতে তা'রীসের ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি হলো- খায়বার অবরোধের এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামকে প্রবল ঘুম আচ্ছন্ন করে। তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁদের ঘুম এতো গভীর ছিল যে, ফজর নামাযের ওয়াক্ত চলে যায়। সূর্যের তেজ গায়ে লাগার পর তাঁরা জেগে উঠেন এবং নামায আদায় করেন।

খায়বার বিজয়ের দিন আবিসিনিয়ায় অবস্থানরত মুহাজিরগণ মদীনা শরীফে পৌঁছান। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত জাফর ইব্ন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বছরই খায়বারে পৌঁছে ইসলাম গ্রহণ করেন।

এ বছর সংঘটিত অন্য গাযওয়া হলো- *গাযওয়ায়ে ওয়াদিল কুরা*। ওয়াদিল কুরা ছিল মদীনা শরীফ ও খায়বারের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ইহুদীদের একটি গ্রাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বছর সাহাবাগণকে নিয়ে *উমরাতুল কাযা* আদায় করেন। এ বছরই সর্বপ্রথম নবীজির জন্য মিম্বার তৈরি করা হয়। তিনি মিম্বারে আরোহণ করে খুতবা প্রদান করেন।

অষ্টম হিজরি

আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল এ বছর মদীনা শরীফে এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সানন্দচিত্তে তাদের স্বাগত জানান।

এ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় মেয়ে হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা ইন্তিকাল করেন। তাঁকে গোসল করানোর পর কাফন পরানোর পূর্বে নবীজি নিজের পরিধেয় জামা হযরত যয়নবের গায়ে জড়ানোর জন্য প্রদান করেন, যাতে এর দ্বারা বরকত লাভ হয়।

এ বছর সংঘটিত গাযওয়াগুলো হলো- *গাযওয়ায়ে মুতা*, *গাযওয়ায়ে যাতুস সালাসিল*, *গাযওয়ায়ে ফতহে মক্কা*, *গাযওয়ায়ে হুনাইন* এবং *গাযওয়ায়ে তায়িফ*। গাযওয়ায়ে মুতায় নবীজি সরাসরি অংশ নেননি।

এ বছর রামাদান মাসে ঐতিহাসিক মক্কা বিজয় সংঘটিত হয়। এ অভিযানকালে নবীজি সাহাবাগণকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে দেন। চতুর্দিক থেকে একই সাথে উচ্চস্বরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে ইসলামী ফৌজ মক্কা নগরীতে প্রবেশ করে। বিনা যুদ্ধে মক্কা নগরী নবীজির করতলগত হয়।

মক্কায় প্রবেশ করে নবীজি প্রথমে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করেন এবং বহুযুগ ধরে স্থাপিত মূর্তিগুলো অপসারণ করে বাইতুল্লাহ শরীফকে পবিত্র করেন। এবারে নবীজি হাসিমুখে মক্কাবাসীর অতীতের সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে ঘোষণা করলেন, *যাও, তোমরা সবাই আযাদ*। মূলত নবীজি চাইলে তখনকার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পুরো মক্কাবাসীকে দাস বানিয়ে রাখতে পারতেন। ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে মক্কা বিজয়ের দিন পর্যন্ত যে আবু সুফিয়ান মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছেন তাকেও আজ দয়াল নবী ক্ষমা করে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এমনকি ওহুদ যুদ্ধের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা সায়্যিদুশ শোহাদা হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কলিজা চিবিয়ে খেয়েছিল সেই হিন্দকে ক্ষমা করে দিয়ে এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মক্কা বিজয়ের পর নবীজি সাহাবীগণকে নিয়ে তায়িফ অবরোধ করেন। হযরত তুফাইল দাওসীর সাথে আনীত মিনজানিক দিয়ে তায়িফের উপর পাথর ছুড়ে মারা হয়। ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম মিনজানিকের ব্যবহার।

এ বছর মক্কা বিজয়ের পর কবি কা'ব ইব্ন জুহাইর মদীনা শরীফে এসে নিজের কৃত অপরাধের জন্য তাওবা করে ইসলাম কবুল করেন। হযরত কা'ব ইব্ন জুহাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় রচিত বিখ্যাত কবিতা *বানাত সুআদ* আবৃত্তি করে শুনান। খুশি হয়ে নবীজি তাঁকে স্বীয় চাদর মুবারক দান করেন। এ বছরই হযরত মারিয়া কিবতিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার গর্ভজাত নবীজির পুত্র সন্তান হযরত ইবরাহীম রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন।

নবম হিজরি

এ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে বিভিন্ন গোত্র-সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটে। এ কারণে এ বছরের নাম হয়ে যায় *প্রতিনিধি আগমনের বছর*। এদের মধ্যে একটি হলো নাজরানবাসী খ্রিস্টানদের প্রতিনিধি দল। তারা মদীনা শরীফে এসে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আনীত ধর্মের সত্যতা নিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়। এরই প্রেক্ষিতে মুবাহালার আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহপাক জানিয়ে দিলেন-

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِن بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ.

"অতঃপর আপনার নিকট জ্ঞান (সত্য সংবাদ) আসবার পর যদি এই বিষয়ে আপনার সাথে কেউ বিবাদে লিপ্ত হয় তাহলে বলে দিন, এসো আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমরা তোমাদের পুত্রগণকে এবং আমরা আমাদের নারীদেরকে এবং তোমরা তোমাদের নারীদেরকে আর আমরা নিজেদেরকে এবং তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ডেকে আনি। তারপর সবাই মিলে দোয়া করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ কামনা করি তাদের ওপর যারা মিথ্যাবাদী" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬১)।

প্রতিনিধি দলগুলোর অন্যান্যরা হলো- বনি তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দল, বনি হানীফা গোত্রের প্রতিনিধি দল। এই দলে ছিলো মুসায়লামা ইব্ন হাবীব নামক এক ব্যক্তি। এ দল ফেরত যাবার পথে *ইয়ামামা* নামক স্থানে পৌঁছবার পর মুরতাদ হয়ে যায়, এমনকি *মুসায়লামাতুল কায্যাব* নবুওয়াতের দাবি করে বসে।

যায়েদ আল খায়ল নামক ব্যক্তির নেতৃত্বে আসে তাঈ গোত্রের প্রতিনিধি দল। তাঁরা পরিপূর্ণরূপে ইসলাম কবুল করেন। বনি যুবাইদ গোত্রের প্রতিনিধি দলও এসে ইসলাম কবুল করেন। ইয়ামানের একটি প্রতিনিধি দলও আসে। ইয়ামানের প্রতিনিধি দল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে বলেছিলেন, *তোমাদের কাছে ইয়ামানবাসীরা এসেছে। এদের অন্তকরণ অত্যন্ত কোমল ও নম্র। ঈমান ও হিকমাত হচ্ছে ইয়ামনীদের সম্পদ*।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ গাযওয়া *গাযওয়ায়ে তাবূক* এ বছরই সংঘটিত হয়। তাবূকে কিছু দিন অবস্থান করে নবীজি

ফিরে আসেন। দুশমনের সাথে সম্মুখ সমর হয়নি। তাবূকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবী হযরত যুলইয়াদাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তিকাল করেন। নবীজি তাঁর কবরে অবতরণ করে হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, তাঁকে আমার কাছে দাও। প্রিয় নবীজি নিজ হাত মুবারক দিয়ে তাঁর লাশ কবরে রেখে দোয়া করলেন- *হে আল্লাহ! আমি তাঁর উপর সন্তুষ্ট অবস্থায় পার করে দিলাম। তুমিও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও*।

এ বছরই কতিপয় মুনাফিক কুবার ঐতিহাসিক মসজিদের ক্ষতিসাধনের গোপন বাসনা নিয়ে একটি মসজিদ নির্মাণ করে। পবিত্র কুরআনে এ মসজিদটিকে

মসজিদে দিরার (মুসলিম উম্মাহকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মসজিদ) নামে আখ্যায়িত করা হয়। আল্লাহপাক ঘোষণা করেন-

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ.

"আর যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে ক্ষতিসাধন এবং কুফরী ও মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ঐ ব্যক্তির জন্য গোপন ঘাটিস্বরূপ যে পূর্ব থেকেই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে। আর তারা অবশ্যই শপথ করবে, আমরা কেবল কল্যাণের উদ্দেশ্যেই করেছি। আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যাবাদী" (সূরা তাওবা, আয়াত ১০৭)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় সাহাবীকে ডেকে এনে নির্দেশ দিলেন, এ মসজিদকে পুড়িয়ে ধুলিস্মাৎ করে দাও।

এ বছরই নবীজি বিশেষ কারণে স্বীয় পত্নীগণের সাথে মেলামেশার সম্পর্ক সাময়িকভাবে ছিন্ন করেন। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহপাক ঘোষণা করেন-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا.

وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيْمًا.

"হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে জানিয়ে দিন, যদি তোমরা পার্থিব জীবনের বিলাসিতা কামনা কর তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ও আখিরাতের জীবন কামনা করো তবে আল্লাহ তোমাদের সৎকর্মশীলদের জন্য মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন" (সূরা আহযাব, আয়াত ২৮-২৯)।

এ বছর হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর দ্বিতীয় পত্নী নবীকন্যা হযরত উম্মে কুলছূম রাদিয়াল্লাহু আনহা ইন্তিকাল করেন। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী (নাজ্জাশী তাঁর রাষ্ট্রীয় উপাধি, প্রকৃত নাম আসহিমাহ) ইন্তিকাল করলে নবীজি মদীনা শরীফে সাহাবীগণকে এ সংবাদ প্রদান করেন এবং সবাইকে নিয়ে গায়েবানা জানাযা পড়েন।

এ বছর পারস্যের সম্রাটকে হত্যা করে তার মেয়ে পুরানদাখতকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- *সেই জাতির কল্যাণ নেই যারা মহিলাকে তাদের শাসনকর্তৃত্বে বসায়*। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বছর হজ্জযাত্রীগণের নেতৃত্ব দেন। পরবর্তীতে নবীজি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও পাঠান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, এ বছরের পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। আর উলঙ্গ হয়ে কেউ কা'বা শরীফ তাওয়াফও করতে পারবে না (জাহিলি যুগে লোকেরা উলঙ্গ হয়ে কা'বাঘর তাওয়াফ করতো)।

দশম হিজরি

এ বছর ইয়ামানের বাজিলা গোত্রের সরদার হযরত জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ বাজালী ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন। এ কারণে হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে এই উম্মতের ইউসুফ নামে অভিহিত করেছিলেন।

ইয়ামানবাসীরা যুলখালাসা নামক স্থানে একটি মূর্তি স্থাপন করেছিলো। তারা এই মূর্তির কাছে পশু বলি দিতো, এই মূর্তিকে ঘিরে তারা তাওয়াফ করতো। তারা এটিকে *ইয়ামানের কা'বা* নামে অভিহিত করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই মূর্তি ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি এই মূর্তিটি আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করেন।

এ বছরই রোম সাম্রাজ্যের আরব সংলগ্ন এলাকায় নিযুক্ত গভর্ণর ফাওরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ

করেন। এ প্রতিনিধির মাধ্যমে ফাওরা নবীজির খিদমতে একটি ঘোড়া ও একটি খচ্চর হাদিয়া পাঠান এবং নিজের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ প্রদান করেন।

রোমানরা যখন জেনে গেলো যে, ফাওরা মুসলমান হয়েছেন তখন তারা তাঁকে ঘেরাও করে রেখে হত্যা করে।

এ বছরই আসওয়াদ আনাসী নামক এক ব্যক্তি নবুওয়াত এবং ইয়ামানের বাদশাহী দাবি করে বসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানবাসী মুসলমানগণের কাছে সংবাদ পাঠান যে, তাঁরা যেনো আসওয়াদ আনাসীকে হত্যা করার জোর প্রচেষ্টা চালায়। শেষ পর্যন্ত ইয়ামানের শাসক ফিরোজের সাহসিকতায় আসওয়াদকে হত্যা করা হয়।

এ বছর হযরত মারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার গর্ভজাত নবীজির পুত্রসন্তান হযরত ইবরাহীম রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তিকাল করেন। হযরত আদী ইব্‌ন হাতিম

(রা) মদীনা শরীফে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ বছরই *মুসায়লামা কাযযাব* নবুওয়াতের দাবি উত্থাপন করে। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চিঠি লিখে নবুওয়াতের অংশিদারিত্ব দাবি করে। নবীজি পত্রের উত্তর দিয়ে তার এ মিথ্যা দাবি খণ্ডন করেন এবং তাকে *আল কাযযাব* বা ডাহা মিথ্যাবাদী নামে আখ্যায়িত করেন। এ বছরই বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়।

একাদশ হিজরি

এ বছরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে ইয়ামানের নাখআ গোত্রের প্রতিনিধি দল আসে। এটিই ছিলো সর্বশেষ প্রতিনিধি দল।

এ বছরের রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন।

এ বছর বনি তামীম গোত্রের সাজাহ বিনতে হারিছ তামীমিয়্যা নবুওয়াত দাবি করে। তার গোত্রের অনেক লোক তার অনুসারী হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার মুসায়লামা কাযযাবের সাথে তার বিয়ে হয়। ইয়ামামার যুদ্ধে মুসায়লামা নিহত হলে সাজাহ তাওবা করে মুসলমান হয়ে যান। পরবর্তীতে তিনি বাসরায় চলে যান এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন।

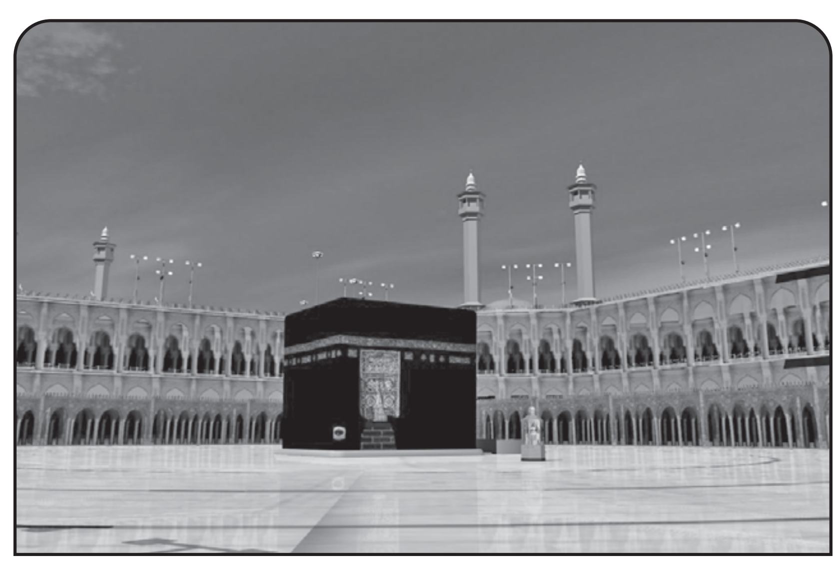
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পূর্বেই তুলায়হা ইব্‌ন খুওয়াইলিদ আসাদী মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করে। সে দাবি করতে থাকে যে, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তার কাছে আসেন। সায়্যিদুনা আবু বাক্‌র সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা মনোনীত হওয়ার পর তুলায়হাকে হত্যা করার জন্য হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাড়া খেয়ে তুলায়হা সিরিয়ায় পালিয়ে যায়। সায়্যিদুনা আবু বাক্‌র সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তিকাল পর্যন্ত সে তথায় অবস্থান করে। পরবর্তীতে তুলায়হা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সায়্যিদুনা উমার ইব্‌ন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর হাতে বাইআত হন।

এ বছরই সায়্যিদুনা আবু বাক্‌র সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশে সায়্যিদুনা খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেনাপতিত্বে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার মুসায়লামা কাযযাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ খুবই কষ্টকর এবং কঠোর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসে এবং তাঁরা বিজয়ী হন। এ যুদ্ধে হযরত ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্শার আঘাতে মুসায়লামা কাযযাবকে হত্যা করেন। এ কারণে হযরত ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, জাহিলিয়াতের সময় আমি একজন মহান ব্যক্তিকে শহীদ করেছিলাম আর ইসলাম গ্রহণের পর একজন নিকৃষ্টতম মানুষকে হত্যা করেছি।

পরিশিষ্ট

নবী জীবনের

পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত কিছু স্থানের স্থির চিত্র

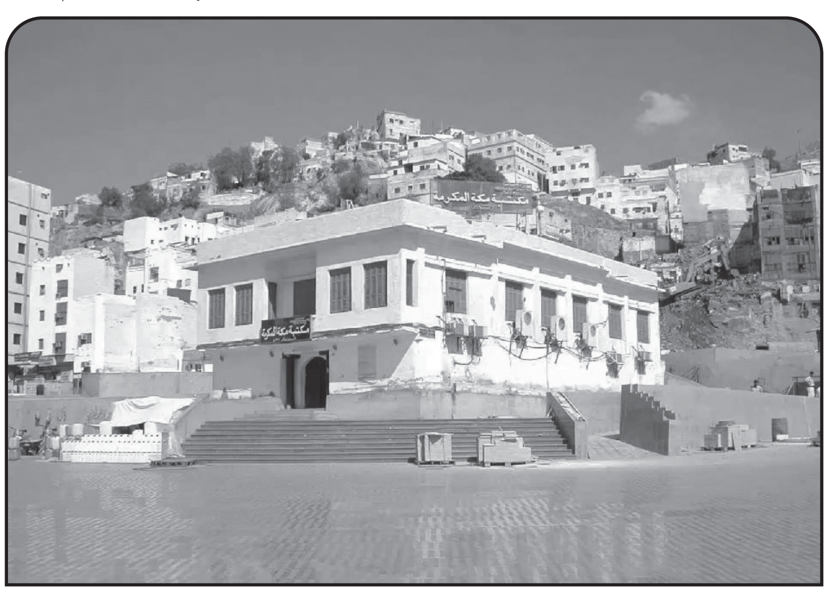


কা'বা শরীফ ও মসজিদুল হারাম : কুরআনে কারীমের ঘোষণামতে কা'বা হচ্ছে পৃথিবীর বুকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য স্থাপিত প্রথম ঘর। কা'বা শরীফের চারপাশ ঘিরে রয়েছে মসজিদুল হারাম। মসজিদুল হারামের কথাও কুরআন শরীফে উল্লেখ আছে। কা'বা শরীফ প্রথমত ফেরেশতা কর্তৃক স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন যুগে কা'বা শরীফ ও মসজিদুল হারাম বহুবার পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করা হয়েছে। যারা করেছেন তাঁদের নাম ধারাবাহিকভাবে নিম্নে দেয়া হলো।

আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম, হযরত শীছ আলাইহিস সালাম, হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম। আমালিকা সম্প্রদায়, জুরহুম গোত্র, কুসাই ইব্ন কিলাব, কুরাইশ সম্প্রদায়। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়ির রাদিয়াল্লাহু আনহু ৬৫ হিজরিতে, হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ ৭৪ হিজরিতে, উসমানি সুলতান মুরাদ ১০৪০ হিজরিতে, বাদশা ফাহাদ ১৪১৭ হিজরিতে।

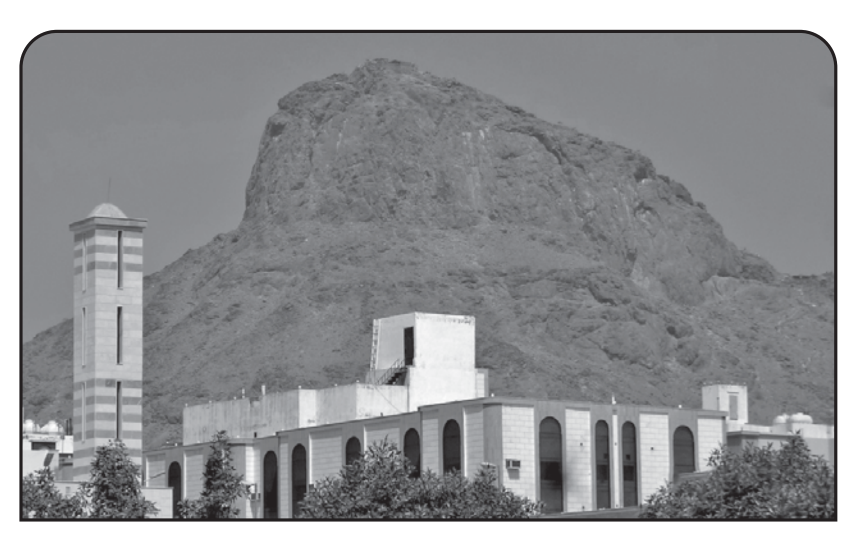
উল্লেখ্য যে, কুরাইশ সম্প্রদায় যখন কা'বা শরীফ পুনর্নির্মাণ করেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স পঁয়ত্রিশ বছর। সীরাতের কিতাবাদির বর্ণনামতে নবীজি স্বয়ং নির্মাণ কাজে অংশ নিয়েছেন। বিশেষ করে হাজরে আসওয়াদ প্রতিস্থাপন নিয়ে যখন কুরাইশদের মধ্যে চূড়ান্ত বিরোধ দেখা দেয়, তখন কুরাইশের সে সময়কার সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি আবু উমাইয়্যা

মাখযুমির নির্দেশনামতে বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব আল আমীন বা পরম বিশ্বস্ত বলে খ্যাত যুবক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অর্পণ করা হয়। তিনি একটি চাদর বিছিয়ে নিজ হাতে চাদরের মধ্যখানে হাজরে আসওয়াদ রাখলেন। বললেন, বিবদমান প্রত্যেক গোত্রের সরদার চাদর ধরে জান্নাতি এ পাথর স্থাপনের জায়গায় পৌঁছে দেবেন। তাই করা হলো। এবার তিনি নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করে দিলেন। এভাবেই সে সময় কুরাইশদের একটি আসন্ন রক্তপাত এড়ানো সম্ভব হয়েছিলো।

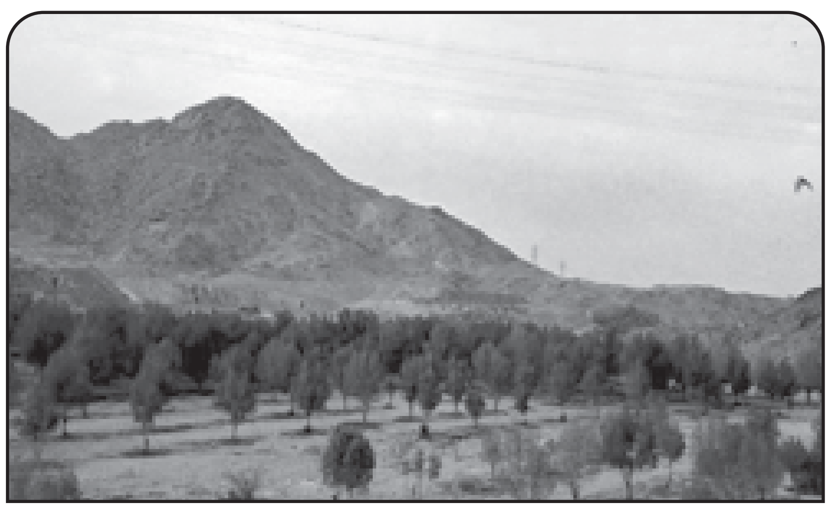


মাওলিদুন্নবী বা নবীজির জন্মস্থান : মসজিদে হারাম থেকে পূর্বদিকে বাবুস সালাম দিয়ে বের হলে একটু দূরে অনুচ্চ টিলার উপর মাকতাবাহ মাক্কাতুল মুকাররামাহ সাইনবোর্ডধারি একটি দ্বিতল বিল্ডিং দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্থানেই ছিলো সেই মুবারক ঘর যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন যুগে এ ঘরের মালিকানা বিভিন্ন জনের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। বাদশা হারুনুর রশীদের (১৪৯-১৯৩ হিজরি) মা খাইযুরাল এ ঘরকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। ভিন্ন বর্ণনায় হারুনুর রশীদের মহিয়সী পত্নী যুবাইদা এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটি পরবর্তীতে ভেঙ্গে ফেলা হয়।

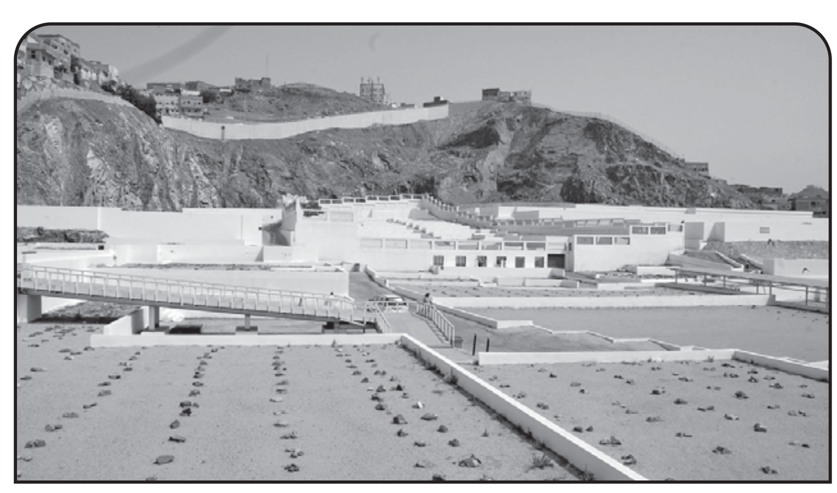
১৩৭০ হিজরি মুতাবিক ১৯৫০ সালে শায়খ আব্বাস আল কাত্তান এ স্থানটিতে মাকতাবাহ বা লাইব্রেরি নির্মাণ করেন।



জাবালে নূর : মসজিদে হারাম থেকে ৪ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত এ পাহাড়ের চূড়ায় হেরা গুহায় প্রথম ওহী নাযিল হয়।



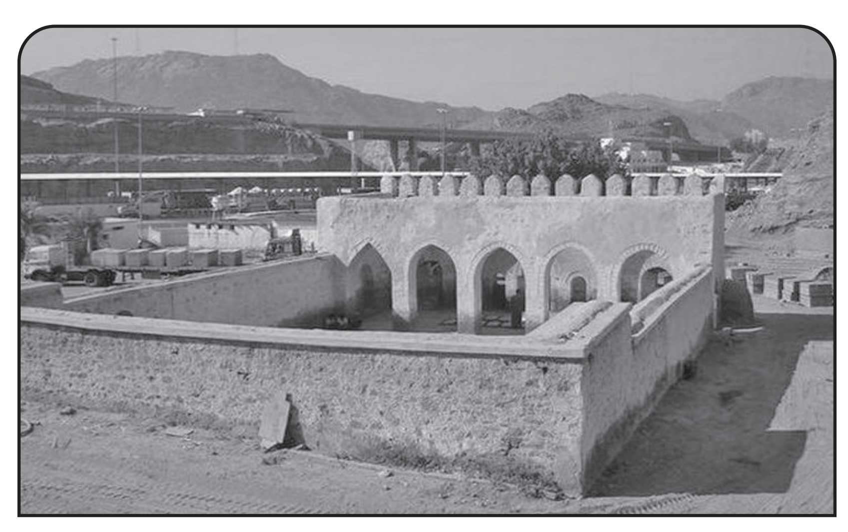
জাবাল সাওর : মসজিদে হারাম থেকে দক্ষিণ দিকে ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এ পাহাড়ের গুহায় হিজরতের সময় নবিজি (সা) হযরত আবু বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে তিন রাত অবস্থান করেন।



জান্নাতুল মুআল্লা : মক্কা শরীফের প্রাচীন কবরস্থান। বর্তমানে তিনভাগে বিভক্ত এ কবরস্থানের তৃতীয় অংশে উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কবর রয়েছে। এখানে কবরস্থ আছেন বহু সাহাবী, তাবিঈসহ হাজার হাজার সালাফে সালিহীন।



মসজিদে জিন : মক্কা শরীফের এ স্থানে নাসিবীনবাসি নয়জন জিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর শুরুতে এ স্থানে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করা হয়। যুগে যুগে মসজিদটি সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে।



মসজিদে বাইআহ বা মসজিদে আকাবা : মসজিদে হারাম থেকে মীনায় যাবার পথে মীনায় প্রবেশের একটু আগে হাতের বাম পাশে পাহাড় ঘেরা স্থানে রয়েছে এ মসজিদ। আকাবা নামক এ স্থানে মদীনাবাসী আনসারগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। ১৪৪ হিজরিতে আব্বাসি খলিফা আবু জাফর মানসূর ঐতিহাসিক ও বরকতপূর্ণ এ স্থানে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন।

পরবর্তীতে বিভিন্ন যুগে এ মসজিদের সংস্কার কাজ হয়েছে। সর্বশেষ উসমানি সালতানাতের যুগে এ মসজিদের সংস্কার কাজ করা হয়। এরপর থেকে আর কোন সংস্কার করা হয়নি। ইমাম আযরাকি (ওফাত : ২৪৪ হিজরি), ইমাম ফাকিহি (ওফাত ২৭২ হিজরি), ইমাম ইবনুল জাওযি (ওফাত ৫৯৭ হিজরি) প্রমুখ নিজ নিজ কিতাবে গুরুত্বের সাথে এ মসজিদের উল্লেখ করেছেন।



মসজিদুল খাইফ : মীনায় অবস্থিত প্রাচীন মসজিদ। ইমাম তাবারানী, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম মুনযিরী প্রমুখের বর্ণনামতে বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে খাইফে ফজরের নামায আদায় করেছেন। নামাযের পর দীর্ঘ সময় খুতবা প্রদান করেছেন।

ইমাম বায়হাকী সুনানে কুবরা কিতাবে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছে যে, মসজিদে খাইফে সত্তরজন নবী নামায আদায় করেছেন।

বিভিন্ন যুগে এই মসজিদের সংস্কার করা হয়েছে। সর্বশেষ ১৪০৭ হিজরি সালে সম্প্রসারণ করা হয়।



মসজিদে নামিরা : ইতিহাসের কোন কোন বর্ণনামতে আরাফাত ময়দানে যে স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বিদায় হজ্জের সময় তাঁর তাবু খাটানো হয়েছিল সেখানে এই মসজিদ নির্মিত হয়েছে। মসজিদের অংশবিশেষ আরাফাত ময়দানের বাইরে পড়েছে। সেই স্থানে আব্বাসী খিলাফতের শুরুর দিকে ছোট আকারে এ মসজিদ নির্মাণ করা হয়। কাল পরিক্রমায় এ মসজিদ সম্প্রসারিত হয়েছে। মিসরীয় শাসক সুলতান আশরাফ কায়তবায় ৮৮৪ হিজরিতে মসজিদে নামিরা সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ সম্পন্ন করেন।

১২৭২ হিজরিতে উসমানি সালতানাতের অধীন এ মসজিদ ব্যাপক সম্প্রসারিত হয়। বাদশা ফাহাদের যুগে মসজিদটি এযাবতকালের সবচেয়ে বেশি সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মুসল্লি একসাথে এখানে নামায আদায় করতে পারেন।



মসজিদে মাশআরুল হারাম : মুফাসসিরিনে কিরামের মতে কুরআন শরীফে উল্লিখিত মাশআরুল হারাম দ্বারা সম্পূর্ণ মুযদালিফাকে বুঝানো হয়েছে। মাশআরুল হারাম নামে মুযদালিফায় যে মসজিদ আছে এই স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে অবস্থানকালে ফজরের নামায আদায় করেছেন মর্মে ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে।

হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর শুরুতে প্রথম এ মসজিদ নির্মিত হয়। কালের আবর্তে এক সময় এ মসজিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ৭৬০ হিজরিতে মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করা হয়। ৮৭৪ হিজরিতে সুলতান আশরাফ কায়তবায় এ মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। উসমানি সালতানাতের যুগে ১০৭২ হিজরিতে পুরাতন বিল্ডিং ভেঙ্গে সম্প্রসারিত নতুন বিল্ডিং করা হয়। সর্বশেষ ১৩৯৫ হিজরিতে এ মসজিদ সম্প্রসারণ করা হয়েছে।



মসজিদে হুদাইবিয়া : মসজিদে হারাম থেকে চব্বিশ কিলোমিটার দূরে হারাম এলাকার বাইরে মক্কা- জেদ্দা পুরাতন রাস্তার পাশে অবস্থিত। নতুন নির্মিত মসজিদের পাশে অতি প্রাচীন একটি মসজিদের ধ্বংশাবশেষ এখনো আছে। কোন কোন গবেষকের ধারণা, প্রাচীন মসজিদের স্থলে ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি হয়েছিলো।

হুদাইবিয়া ইসলামের ইতিহাসে একটি বিখ্যাত স্থান, যদিও বর্তমানে এলাকাটির নাম পরিবর্তন করে শুমায়ছি রাখা হয়েছে। হুদাইবিয়ায় সংঘটিত কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা হলো-

ছয় হিজরিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দ শত ভিন্ন বর্ণনায় সতেরো শত সাহাবীকে নিয়ে ইহরাম পরিহিত অবস্থায় উমরা পালনের জন্য আসেন। হুদাইবিয়ায় পৌঁছার পর মক্কাবাসী মুশরিকরা বাধা দেয়। অনেক বাদানুবাদের পর নবীজি মক্কাবাসীর সাথে সন্ধিচুক্তি করে উমরা আদায় না করেই মদীনা শরীফে ফিরে যান।

এখানেই সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক হাতে জিহাদের বাইআত করেন, যা বাইআতে রিদওয়ান নামে খ্যাত।

বি'রে হুদাইবিয়া বা হুদাইবিয়া নামক কূপ থেকে এখানে অবস্থানরত সাহাবায়ে কিরাম পানি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু একসাথে এতো লোকের ব্যবহারের ফলে

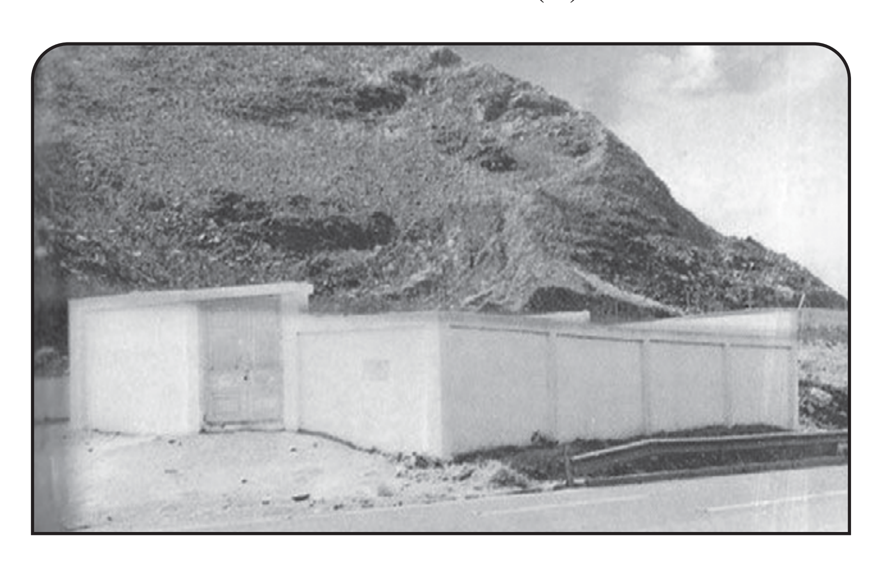
কূপের পানি শুকিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কূপের কিনারে গিয়ে কুলি করে কূপে নিক্ষেপ করেন। সাথে সাথে কূপটি পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

এখানেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত মুবারকের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি প্রবাহিত হবার মু'জিযা সংঘটিত হয়।



মসজিদে আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহাঃ মসজিদে হারাম থেকে সাড়ে সাত কিলোমিটার উত্তরে (হিজরাহ রোডে) তানঈম নামক স্থানে অবস্থিত।

দশম হিজরিতে বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে হযরত আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এই স্থান থেকে উমরার ইহরাম করেন।

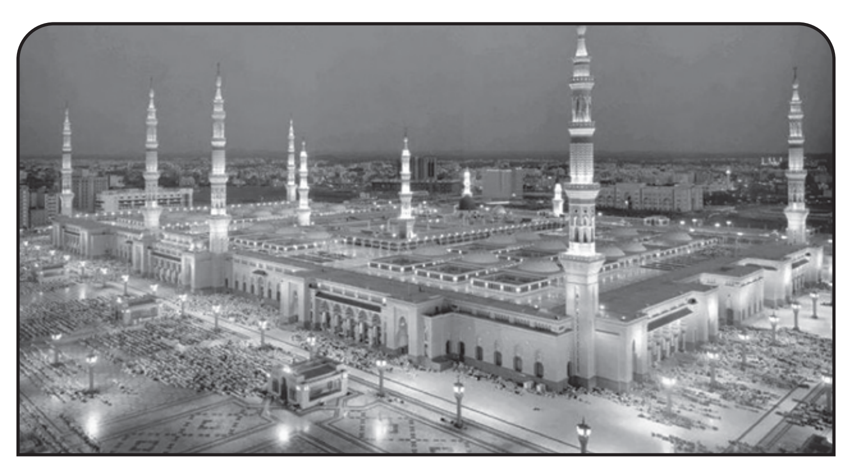


হযরত মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার কবর : মসজিদে হারাম থেকে বিশ কিলোমিটার উত্তরে (হিজরাহ রোডে) সারিফ নামক উপত্যকায় অবস্থিত। বর্তমানে স্থানটির নাম নাওরিয়া ।

সপ্তম হিজরিতে উমরাতুল কাযা আদায়কালে সারিফ উপত্যকায় এই স্থানটিতে একটি গাছের নীচে খাটানো তাঁবুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত মায়মুনার বিয়ে হয়। একান্ন হিজরিতে উমরা আদায় করে মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফ ফেরার পথে এই স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন। এখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।



মসজিদে জি'রানা : মসজিদে হারাম থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে ২৫ কিলোমিটার দূরে জি'রানা নামক পাহাড়ের পাদদেশে এ মসজিদ অবস্থিত। অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইন অভিযানে গমন করেন। সফল অভিযানশেষে ফেরার পথে জি'রানা পাহাড়ের পাদদেশে তাঁবু খাটিয়ে তিন দিন অবস্থান করেন। এখান থেকে ইহরাম পরিধান করে মক্কা শরীফ এসে উমরা আদায় করেন। ঠিক যে স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম পরে নামায আদায় করেছিলেন সেখানেই হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর শুরুর দিকে মসজিদ স্থাপিত হয়। কালক্রমে এ মসজিদ সম্প্রসারিত হয়েছে।



মসজিদে নববী : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক হাতে গড়া দ্বিতীয় মসজিদ হলো মসজিদে নববী। দুনিয়াব্যাপী ইসলামের প্রচার প্রসারের মূল কেন্দ্র হলো এ মসজিদ। এখানেই শায়িত আছেন শাফিউল মুযনিবীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর প্রিয় দুই সাহাবী হযরত আবু বাকর ও হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা।

প্রথম হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে নিয়ে নির্মাণ করেন এ মসজিদ। দৈর্ঘ্যে ৩৫ মিটার এবং প্রস্থ ৩০ মিটার মসজিদের ভিত রচিত হয় পাথর দিয়ে। সপ্তম হিজরিতে খায়বার বিজয়ের পর নবীজি স্বয়ং প্রথম মসজিদের আয়তন বৃদ্ধি করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন যুগে প্রয়োজনের তাগিদে মসজিদে নববীর আয়তন বৃদ্ধি ও সংস্কারের কাজ করা হয়। যেমন-

খলীফা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৭ হিজরিতে, খলীফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ২৯ হিজরিতে কাজ শুরু করে ৩০ হিজরিতে সমাপ্ত করেন। উমাইয়্যা খলীফা ওয়ালিদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের নির্দেশে মদীনা শরীফের গভর্নর উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয ৮৮ হিজরিতে কাজ শুরু করে ৯১ হিজরিতে সমাপ্ত করেন। আব্বাসি খিলাফতকালে মাহদি ইব্‌ন আবু জাফর ১৬১ হিজরিতে কাজ শুরু করে ১৬৫ হিজরিতে সমাপ্ত করেন।

সুলতান আশরাফ কায়তবায় ৮৮২ হিজরিতে কাজ শুরু করে ৮৮৮ হিজরিতে সমাপ্ত করেন। উসমানি সুলতান আবদুল মজিদ ১২৬৫ হিজরিতে কাজ শুরু করে ১২৭৭ হিজরিতে সমাপ্ত করেন। বাদশা ফাহাদ ১৪০৫ হিজরিতে শুরু করে ১৪১৪ হিজরিতে সমাপ্ত করেন।



মসজিদে কুবা : মসজিদে নববী থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে কুবা নামক পল্লীতে এ মসজিদ অবস্থিত। মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদীনা শরীফ আগমনকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে বনু আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের কুলছুম ইবনুল হিদম রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে কিছুদিন অবস্থান করেন। এ সময় তিনি কুলছুম ইবনুল হিদম রাদিয়াল্লাহু আনহুর মালিকানাধীন ভূমিতে নির্মাণ করেন এ মসজিদ। মসজিদে কুবা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক হাতে গড়া ইসলামের প্রথম মসজিদ। নবীজি নিজে এ মসজিদে নামায আদায় করেছেন। দ্বিতীয় হিজরিতে কিবলা পরিবর্তন হলে কুবাবাসী নতুন করে মসজিদ নির্মাণ করতে চাইলে নবীজি নিজ হাতে কিবলা ঠিক করে দেন এবং নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেন।

মসজিদে কুবার কথা কুরআন শরীফে উল্লেখ আছে। বুখারী-মুসলিমে উল্লিখিত হাদীসের ভাষ্যমতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি শনিবার মসজিদে কুবায় তাশরিফ নিতেন এবং নফল নামায আদায় করতেন। সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি নিজ ঘরে উযু করে মসজিদে কুবায় গিয়ে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করলো সে একটি উমরা পালনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে।

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম মসজিদে কুবার সম্প্রসারণের কাজ করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন যুগে এ মসজিদ সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বর্তমান মসজিদ বিল্ডিংয়ের কাজ ১৪০৫ হিজরিতে শুরু হয়, শেষ হয় ১৪০৭ হিজরিতে।



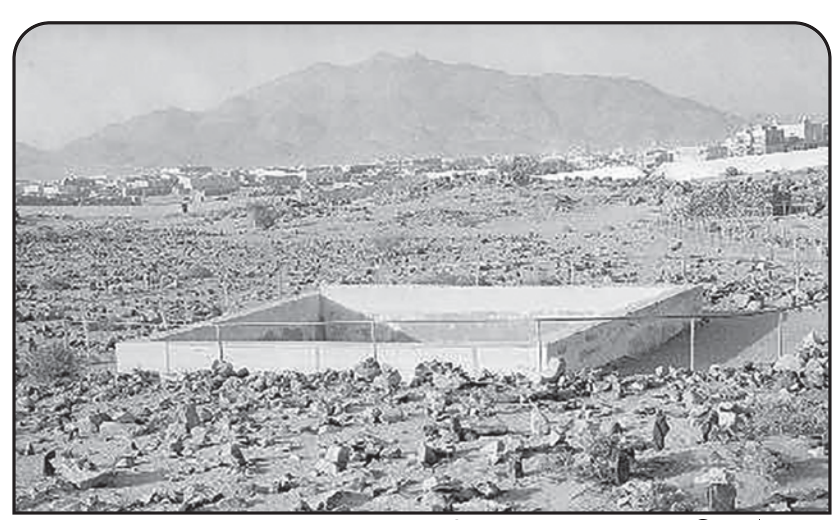
মসজিদুল জুমুআহ : মসজিদে নববী থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে কুবার পথে এ মসজিদ অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের সময় কুবা থেকে যেদিন মদীনা শরীফ আসেন সেই দিনটি ছিলো শুক্রবার। পথিমধ্যে ওয়াদিয়ে বনি সালিম উপত্যকায় আসার পর জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায়। সাহাবায়ে কিরামকে সাথে নিয়ে নবীজি এখানে জুমুআর নামায আদায় করেন। নবীজি সেদিন জুমুআর খুতবা প্রদান করেন। এটিই ছিলো তাঁর প্রথম খুতবা এবং প্রথম জুমুআর নামায।

পরবর্তীতে সাবায়ে কিরাম এ স্থানে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। উসমানি সুলতান বায়াযীদ (শাসনকাল: ৮৮৬- ৯১৮ হিজরি) সাহাবা যুগে নির্মিত এ মসজিদ সম্প্রসারণ ও পুননির্মাণ করেন। দীর্ঘ সাড়ে চার শত বছর পর মসজিদটি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হলে বাদশা ফাহাদ ইব্‌ন আবদুল আযীয ১৪১৬ হিজরিতে তা পুননির্মাণ করেন।



মসজিদে আরীশ : দ্বিতীয় হিজরির সতেরো রামাদান সংঘটিত বদর যুদ্ধের সময় এই স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আরীশ বা ছাউনি নির্মাণ করা হয়। এখান থেকেই তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করেন। যুদ্ধের আগের রাতে যুদ্ধে বিজয় দানের জন্য তিনি রাতভর এখানেই দোয়া করেন। আরীশে অবস্থানকালে হযরত আবু বাকর সিদ্দীক ও সা'দ ইব্‌ন মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহুমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহরক্ষী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

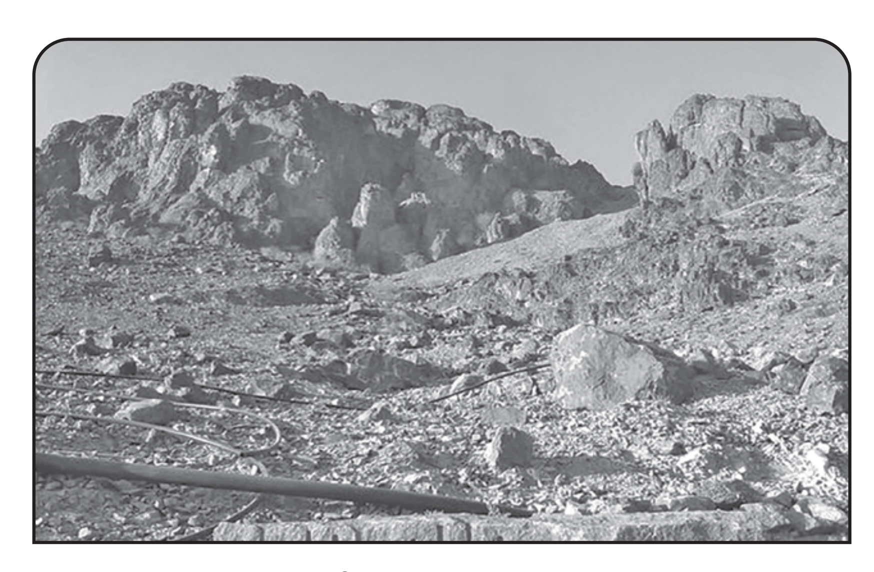
খলিফা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (৬৩-১০১ হিজরি) মদীনা শরীফের গভর্নর থাকাকালীন (৮৮-৯৩ হিজরি) ঐতিহাসিক ও বরকতপূর্ণ এ স্থানটিতে ছোট আকারে মসজিদটি নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন যুগে এ মসজিদ সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে।



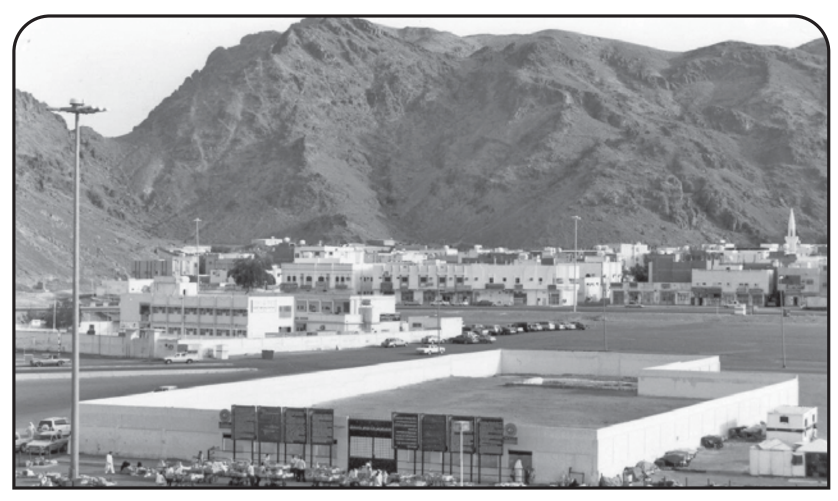
বদর যুদ্ধক্ষেত্রের একাংশ : সাদা দেয়ালবেষ্টিত স্থানে বদর যুদ্ধে শহীদ চৌদ্দজন সাহাবীর কবর ।



বদর যুদ্ধে শহীদগণের নামফলক : শ্বেত পাথরে খোদাইকৃত বদর যুদ্ধে শহীদ চৌদ্দজন সাহাবীর নাম।



ওহুদ পাহাড় (আংশিক): তৃতীয় হিজরিতে সংঘটিত ওহুদ যুদ্ধে আহত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পাহাড়ের একটি গুহায় বিশ্রাম নিয়েছিলেন। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, ওহুদ হলো জান্নাতের পাহাড়গুলোর একটি।



ওহুদ যুদ্ধক্ষেত্র (আংশিক): ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে যুদ্ধক্ষেত্রের একাংশ। বেষ্টনীর মধ্যে রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় চাচা হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ সত্তরজন শহীদ সাহাবীর কবর।



মসজিদে ইজাবা : এই মসজিদের মূল নাম মসজিদে বনি মুআওয়িয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বনি মুআওয়িয়া গোত্রের আনসার সাহাবীগণ এ মসজিদ নির্মাণ করেন।

জান্নাতুল বাকীর উত্তরে সম্প্রসারিত মসজিদে নববীর পূর্বে ৫৮০ মিটার দূরত্বে এ মসজিদ অবস্থিত।

সহীহ মুসলিম ও মুওয়াত্তা ইমাম মালিক এ বর্ণিত হাদীসের ভাষ্যমতে একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বনি মুআওয়িয়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সহসা মসজিদে ঢুকে দুই রাকাত নামায আদায় করে দীর্ঘ মুনাজাত করেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি (এখানে) আল্লাহর কাছে তিনটি জিনিস চেয়েছি। আল্লাহ দুটি দিয়েছেন আর একটি দেননি।

এ দিনের পর থেকে মসজিদটির নাম হয়ে যায় মসজিদে ইজাবা বা দোয়া কবুলের মসজিদ।

বাদশা ফাহাদ ১৪১৮ হিজরি মোতাবেক ১৯৯৭ সালে এ মসজিদ সম্প্রসারণ করেন।



মসজিদে বনি উনাইফ : মসজিদে কুবা থেকে কিছুটা পশ্চিমে, হিজরাহ রোড দিয়ে মদীনা শরীফ আসতে হাতের ডানদিকে মসজিদে বনি উনাইফ অবস্থিত। বর্তমানে প্রাচীন দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া এ মসজিদের অস্তিত্ব নেই।

ইমাম সামহুদিসহ অন্যান্য ইতিহাসবিদ এ মসজিদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বর্ণিত আছে যে, হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে কুবা এলাকায় বসবাসরত বনি উনাইফ গোত্রের এই স্থানটিতে ফজরের নামায আদায় করেছেন। এছাড়া বনি উনাইফ গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তি সাহাবী হযরত তালহা ইব্নুল বারাআ রাদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ হলে নবীজি সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে তাঁকে দেখতে যান। তখনো নামাযের সময় হলে এই একই স্থানে নামায আদায় করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, স্থানীয় বাসিন্দারা নবীজির নামাযের স্থান সযত্নে চিহ্নিত করে রাখেন। পরবর্তীতে এ স্থানটিতে মসজিদ নির্মিত হয়।



মসজিদুল গামামা : মসজিদে নববী থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে নতুন সম্প্রসারণের পর মাত্র তিনশত পাঁচ মিটার দূরে মসজিদুল গামামা অবস্থিত। এ মসজিদের অন্য নাম মসজিদে মুসাল্লা।

মসজিদে নববীর পশ্চিম দক্ষিণ দিকের খোলা ময়দানে বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় ঈদের নামায আদায় করেছেন। সে স্থানগুলোকে চিহ্নিত করে রাখতে পরবর্তীতে ছোট ছোট মসজিদ নির্মাণ করা হয়। যেমন এখানে কাছাকাছি কম দূরত্বে রয়েছে মসজিদে আবু বাকর, মসজিদে উমার, মসজিদে আলী ও মসজিদুল গামামা।

মসজিদুল গামামার স্থানকে নবীজি শেষদিকে ঈদের নামাযের জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছিলেন। এখানে ইসতিসকার নামায আদায়রত অবস্থায় মেঘমালা সূর্যের তেজ থেকে নবীজিকে আড়াল করেছিলো। তাই এ মসজিদের নাম হয় গামামা বা মেঘমালা মসজিদ।

হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয ৮৭ হিজরি থেকে ৯৩ হিজরি পর্যন্ত মদীনা শরীফের গভর্নর ছিলেন। তিনি প্রথম ৯১ হিজরিতে মসজিদুল গামামা নির্মাণ করেন। বিভিন্ন সময়ে এ মসজিদ সংস্কার করা হয়েছে। বর্তমানে যে মসজিদ রয়েছে তা উসমানি খলিফা আবদুল মজিদ কর্তৃক নির্মিত। তিনি ১২৫৫ থেকে ১২৭৭ হিজরি পর্যন্ত উসমানি খিলাফতের শাসক ছিলেন।

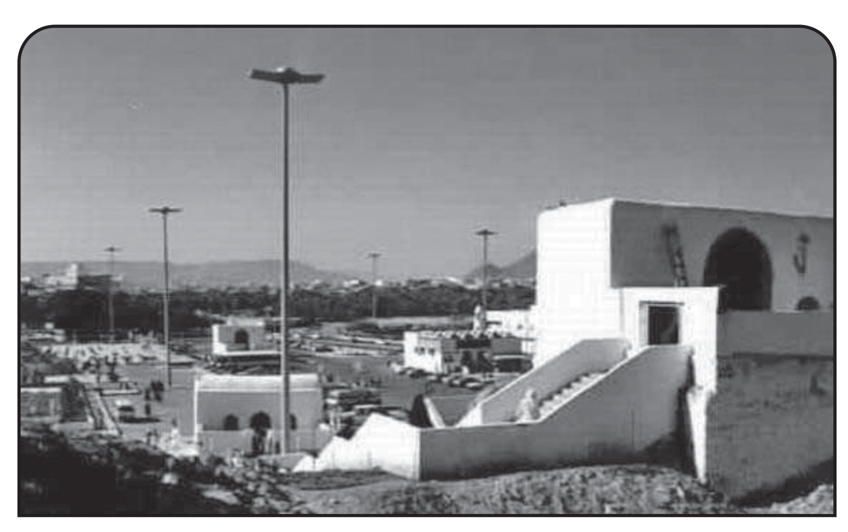


মসজিদ যুল-কিবলাতাইন : মসজিদে নববী থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে বনি সালেমা নামক আনসার গোত্রের মহল্লায় এ মসজিদ অবস্থিত। এ কারণে মসজিদটিকে মসজিদে বনি সালেমাও বলা হয়। বর্তমান খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ রোডের পাশে রয়েছে এ মসজিদ।

বুখারী শরীফে হযরত বারাআ ইব্ন আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষোল কিংবা সতেরো মাস বাইতুল মাকদিসের দিকে নামায আদায় করেন। এরই মাঝে কিবলা পরিবর্তনের হুকুম নাযিল হয়।

ইবনুন নাজ্জারের বর্ণনামতে নবীজি বনু সালেমা গোত্রের এক ব্যক্তির আমন্ত্রণে কিছু সংখ্যক সাহাবীকে সাথে নিয়ে সেখানে তাশরিফ নেন। যোহরের নামাযের সময় হলে নামায শুরু করেন। দুই রাকাত পড়ার পরই কিবলা পরিবর্তনের হুকুম নাযিল হয়। সাথে সাথে বাইতুল মাকদিসের দিক থেকে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে বাকি দুই রাকাত পূর্ণ করেন। এ স্থানেই পরবর্তীতে মসজিদ নির্মাণ করা হয়; নাম রাখা হয় মসজিদ যুল-কিবলাতাইন বা দুই কিবলার মসজিদ।

কোন কোন বর্ণনামতে কিবলা পরিবর্তনের দিনটি ছিলো দ্বিতীয় হিজরির ১৫ শা'বান মঙ্গলবার।



মসজিদে ফাতহ : সাল‘আ পাহাড়ের একেবারে পশ্চিম অংশে মসজিদে নববী থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে পাহাড় চূড়ায় অবস্থিত। খন্দক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ স্থানটিতে অবস্থান করে নামায আদায় করেছেন। পরপর তিন দিন এখানে দোয়া করেছেন। সোম ও মঙ্গলবার দোয়া করলেন এবং বুধবার দোয়া করে সাহাবীগণকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন। এ কারণেই মসজিদটির নাম হয় ফাতহ বা বিজয়ের মসজিদ।

খলিফা উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয মদীনা শরীফের গভর্নর থাকাকালে এ স্থানটিতে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। বর্তমানে যে মসজিদ আছে তা ১২৭০ হিজরিতে উসমানি সুলতান আবদুল মজিদের তৈরি। ১৪১১ হিজরিতে বাদশা ফাহাদ এ মসজিদ কিছু সংস্কার করেন।



মসজিদে শাজারাহ : মসজিদে নববী থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে যুলহুলায়ফা নামক স্থানে এ মসজিদ অবস্থিত। বর্তমানে স্থানটি আবইয়ারু আলী নামে স্থানীয়ভাবে বেশি পরিচিত। যুলহুলায়ফা হলো মদীনাবাসী এবং এ পথে গমনকারীদের জন্য হজ্জ ও উমরার ইহরামের নির্ধারিত মীকাত। এ কারণে মসজিদটির অপর নাম মসজিদে মীকাত।

বুখারী-মুসলিমের বর্ণনামতে যুলহুলায়ফার এ স্থানটিতে একটি গাছ ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরা ও হজ্জ আদায়ের জন্য মক্কা শরীফ যাবার পথে সেই গাছের ছায়াতলে বিশ্রাম নিয়েছেন। কোন কোন বর্ণনায় রাত যাপন করেছেন এবং এখান থেকে ইহরাম করে রওয়ানা দিয়েছেন। এখানে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন খলীফা উমর ইব্ন আবদুল আযীয (৬৩-১০১ হিজরি) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

বাদশা ফাহাদ অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন ৮৮ হাজার বর্গ মিটার মসজিদ কমপ্লেক্স গড়ে তোলেন। কমপ্লেক্সের মধ্যে রয়েছে মসজিদ, রেস্টহাউস, প্রয়োজনীয় দোকানপাট, সুবিশাল গাড়ি পার্কিং ইত্যাদি।



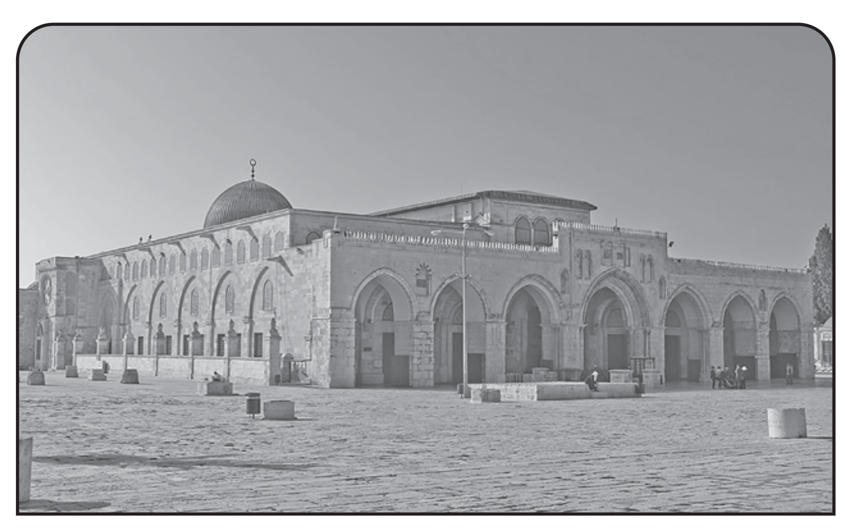
মসজিদে ইতবান : প্রখ্যাত বদরি সাহাবী হযরত ইতবান ইব্‌ন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেছিলেন। পরবর্তীতে সেখানে মসজিদ নির্মিত হয়। নাম হয় মসজিদে ইতবান। বর্তমানে সেই মসজিদ নেই, আছে ধ্বংসাবশেষ। স্থানটি মসজিদে জুমুআর ঠিক উত্তরে সড়কের সাথেই রয়েছে। তা এক সময় দেয়ালবেষ্টিত ছিলো। ১৪১৭ হিজরিতে সে দেয়ালও ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

ইতবান ইব্‌ন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাঁর গোত্রের ইমাম। বার্ধক্যের কারণে চোখের জ্যোতি ক্ষীণ হয়ে গেলে নিয়মিত উপত্যকা পেরিয়ে নামাযে যাতায়াত তাঁর জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, একদা ইতবান ইব্‌ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমার গোত্রের সাথে গিয়ে নিয়মিত নামায আদায় করতে পারি না। বিশেষ করে বৃষ্টির দিনে উপত্যকায় পানি জমে গেলে মোটেই যাওয়া সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় আমার মন চায়, যদি আমার ঘরে তাশরিফ নিয়ে নামায পড়তেন তবে আপনার নামাযের স্থানটিকে আমি আমার নামায আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতাম। নবীজি বললেন, ইনশাআল্লাহ অচিরেই আমি যাবো। ইতবান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন ভোরে আবু বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। আমাকে বললেন, তোমার ঘরের কোন স্থানটি তুমি নামাযের জন্য পছন্দ করো? আমি ঘরের কোণায় স্থান দেখিয়ে দিলাম। তিনি সেখানে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। নবীজির নামায আদায়ের সেই স্থানটিকে আমি আমার নামায আদায়ের জন্য নির্ধারিত করে নিলাম (সহীহ বুখারী, কিতাবুস সালাত, বাবুল মাসাজিদি ফিল বুয়ূত, হাদীস নং ৪২৬)।



জান্নাতুল বাকী' : মসজিদে নববীর পাশে অবস্থিত কবরস্থান। সাহাবীগণের মধ্যে এখানে প্রথম দাফন করা হয় হযরত উসমান ইব্‌ন মাযউন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। দশ হাজারের মত সাহাবীর কবর রয়েছে এখানে। তন্মধ্যে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান, হযরত আব্বাস, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম রয়েছেন। এছাড়া উম্মুল মু'মিনীনগণ, নবীজির দুধ মা হযরত হালিমা, নবীকন্যা হযরত ফাতিমা, হযরত হাসান এবং আহলে বাইতের অন্যান্য ইমামগণ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকীতে কবর যিয়ারতে যেতেন। কোন কোন সময় গভীর রাতে চলে যেতেন সেখানে। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে বাকী'তে দাফনকৃতদের জন্য দোয়া করতেন।



মসজিদে আকসা: মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমামতিতে পূর্ববর্তী নবীগণ এ মসজিদে দুই রাকাত নামায আদায় করেন।



আমিনা রাদিয়াল্লাহু আনহার কবর : মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ যাবার পথে আল-আবওয়া নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আম্মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু আনহার কবর।



বুহায়রার উপাসনালয়ের ধ্বংসাবশেষ : সিরিয়ার বুসরা শহরে খ্রিস্টান ধর্মযাজক বুহায়রার উপাসনালয়ের ধ্বংসাবশেষ।

বারো বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচা আবু তালিবের বাণিজ্য কাফেলার সাথে বুসরা শহরের এই উপাসনালয়ের পাশে একটি গাছের ছায়াতলে বিশ্রাম নেন। ধর্মযাজক বুহায়রা পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবে বর্ণিত আলামত দেখে তাঁকে আখেরি নবী বলে চিহ্নিত করেন। বাণিজ্য কাফেলাকে আপ্যায়ন করে তাড়াতাড়ি এই বালককে নিয়ে মক্কা শরীফ ফিরে যেতে আবু তালিবকে অনুরোধ করেন। বুহায়রা জানান, ইহুদিরা দেখতে পেলে তাঁকে চিনে ফেলবে এবং হত্যার ষড়যন্ত্র করবে।



মসজিদে নাজ্জাশি : দক্ষিণ ইথিওপিয়ার নাগাশ শহরে অবস্থিত মসজিদে নাজ্জাশি। এই মসজিদ কম্পাউন্ডের ভেতরে নির্ধারিত কবরস্থানে অন্যান্য কবরের সাথে চিহ্নিত রয়েছে বাদশা নাজ্জাশির কবর। খ্রিস্টান বাদশা নাজ্জাশি নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে হাবশায় হিজরতকারী সাহাবীগণকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ষষ্ঠ হিজরিতে হুদাইবিয়া সন্ধি-পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বাদশা নাজ্জাশির কাছে পত্র প্রেরণ করেন। হযরত আমর ইব্‌ন উমাইয়্যা দামারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মারফত প্রাপ্ত চিঠি পড়ে বাদশা নাজ্জাশি ইসলাম গ্রহণ করেন। নাজ্জাশি রাষ্ট্রীয় উপাধি। তাঁর নাম হলো আসহিমাহ।

অষ্টম হিজরিতে নাজ্জাশি ইন্তিকাল করলে নবীজি মদীনা শরীফে সাহাবায়ে কিরামকে তাঁর ইন্তিকাল সংবাদ প্রদান করেন। মসজিদে নববীর পশ্চিম দক্ষিণ দিকের খোলা জায়গায় ঈদের নামায আদায়ের স্থানে সবাইকে নিয়ে বাদশা নাজ্জাশির গায়বী জানাযা আদায় করেন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. **আল কুরআনুল কারীম**

২. **আল জামিউস সাহীহ**

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী, ওফাত ২৫৬ হিজরি

আল মীযান-উর্দুবাজার, লাহোর- পাকিস্তান ২০০৪ ঈসায়ি।

৩. **সাহীহ মুসলিম**

ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ আল কুশাইরী নিশাপুরী, ওফাত ২৬১ হিজরি

আল মীযান-উর্দুবাজার, লাহোর- পাকিস্তান ২০০৪ ঈসায়ি।

৪. **সুনান নাসাঈ**

ইমাম আবু আবদুর রাহমান আহমাদ ইব্‌ন আলী নাসাঈ খুরাসানী, ওফাত ৩০৩ হিজরি

মাকতাবাহ রহমানিয়া, উর্দুবাজার- লাহোর, পাকিস্তান।

৫. **জামিউল বায়ান ফী তাফসীর আইল কুরআন (তাফসীরে তাবারী)**

ইমাম আবু জাফার মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী, ওফাত ৩১০ হিজরি

দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা-বৈরুত, লেবানন (তৃতীয় প্রকাশ) ১৯৯৯ ঈসায়ি।

৬. **মুশকিলুল আছার**

ইমাম আবু জাফর আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামাহ তাহাবী, ওফাত ৩২১ হিজরি

মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত- লেবানন।

৭. **দালাইলুন নুবুওয়াহ**

ইমাম আবু নাঈম আহমাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইসপাহানী, ওফাত ৪৩০ হিজরি

মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত- লেবানন (প্রথম প্রকাশ) ২০০৯ ঈসায়ি।

৮. **দালাইলুন নুবুওয়াহ ওয়া মা'রিফাতি আহওয়ালি সাহিবিশ শারীআহ**

ইমাম আবু বাক্‌র আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন বায়হাকী, ওফাত ৪৫৮ হিজরি

দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা- বৈরুত, লেবানন (দ্বিতীয় প্রকাশ) ২০০২ ঈসায়ি।

৯. **আরিদাতুল আহওয়াযী বিশারহি সুনানে তিরমিযী**

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (ইবনুল আরাবী মালিকী), ওফাত ৫৪৩ হিজরি

দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা- বৈরুত, লেবানন- ১৯৯৭ ঈসায়ি।

১০. **আশশিফা বিতা'রীফি হুকুকিল মুস্তাফা**

ইমাম কাযী আয়ায ইব্‌ন মূসা ইয়াহসাবী মাগরিবী, ওফাত ৫৪৪ হিজরি

দারুল ফিক্‌র, বৈরুত লেবানন।

১১. **আররাওদুল উনুফ মা'আ সীরাতে ইবনে হিশাম**

ইমাম আবুল কাসিম আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদ সুহাইলী, ওফাত ৫৬১ হিজরি

দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা- বৈরুত, লেবানন।

১২. **আল ওয়াফা বিআহওয়ালিল মুস্তাফা**

ইমাম আবুল ফারজ আবদুর রাহমান ইবনুল জাওযী, ওফাত ৫৯৭ হিজরি

মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত- লেবানন।

১৩. **তাফসীরে কাবীর**

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ (ফখরুদ্দীন রাযী), ওফাত ৬০৬ হিজরি

দারুল ফিক্‌র, বৈরুত- লেবানন ১৪২৬ হিজরি।

১৪. **আল জামিউ লিআহকামিল কুরআন (তাফসীরে কুরতুবী)**

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ আনসারী কুরতুবী, ওফাত ৬৭১ হিজরি

দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত- লেবানন (প্রথম প্রকাশ) ১৯৯৫ ঈসায়ি।

১৫. **যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খাইরিল ইবাদ**

ইমাম শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আবু বাক্র দিমাশ্কী (ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যা), ওফাত ৭৫১ হিজরি

দারুল ফিক্র, বৈরুত- লেবানন ২০০৭ ঈসায়ি।

১৬. **আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া**

ইমাম ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন উমার ইব্ন কাছীর, ওফাত ৭৭৪ হিজরি

দারুল হাদীস, কায়রো- মিসর ২০০৬ ঈসায়ি।

১৭. **ফাতহুল বারী শারহু সাহীহিল বুখারী**

ইমাম আহমাদ ইব্ন আলী ইব্ন হাজার আসকালানী, ওফাত ৮৫২ হিজরি

দারুল বায়ান আল আরাবী, মিসর।

১৮. **আল ইসাবা ফী তাম্য়িযিস সাহাবা**

ইমাম আহমাদ ইব্ন আলী ইব্ন হাজার আসকালানী, ওফাত ৮৫২ হিজরি

মাকতাবাহ দারুল মা'আরিফ, বৈরুত- লেবানন (দ্বিতীয় প্রকাশ) ২০১০ ঈসায়ি।

১৯. **দালায়িলুল খায়রাত ওয়া শাওয়ারিকুল আনওয়ার ফী যিকরিস্ সালাতি আলান নাবিয়্যিল মুখতার**

ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান আল জাযুলী, ওফাত ৮৭০ হিজরি

বাইতুল কুরআন, উর্দুবাজার- করাচী, পাকিস্তান।

২০. **আল কাওলুল বাদী' ফিস সালাতি আলাল হাবীবিশ শাফি'**

ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রাহমান সাখাবী, ওফাত ৯০৬ হিজরি

দারুল কিতাব আল আরাবী, বৈরুত- (প্রথম প্রকাশ) ১৯৮৫ ঈসায়ি।

২১. **খাসাইসুল কুবরা**

ইমাম আবুল ফাদ্ল জালালুদ্দীন আবদুর রাহমান ইব্ন আবু বাক্র সুয়ূতী, ওফাত ৯১১ হিজরি

দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত- লেবানন (দ্বিতীয় প্রকাশ) ২০০৮ ঈসায়ি।

২২. **হাদাইকুল আনওয়ার ওয়া মাতালিউল আসরার ফী সীরাতিন নাবিয়্যিল মুখতার**

শাইখ মুহাম্মাদ ইব্ন উমার বাহরাক হাদরামী শাফিয়ী, ওফাত ৯৩০ হিজরি

দারুল মিনহাজ, বৈরুত- লেবানন ২০০৩ ঈসায়ি।

২৩. **শারহু ফিকহিল আকবার**

ইমাম মোল্লা আলী কারী, ওফাত ১০১৪ হিজরি,

কাদিমী কুতুবখানা, আরামবাগ- করাচী- পাকিস্তান।

২৪. **শারহুশ শিফা লিল কাযী আয়ায**

ইমাম মোল্লা আলী কারী, ওফাত ১০১৪ হিজরি

দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত- লেবানন।

২৫. **নাসীমুর রিয়াদ ফী শারহি শিফা লিকাযী আয়ায**

ইমাম শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন উমার আল খাফফাজী মিসরী, ওফাত ১০২৯ হিজরি

দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত- লেবানন (প্রথম প্রকাশ) ২০০১ ঈসায়ি।

২৬. **শারহুয যুরকানী আলাল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়্যা**

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল বাকী ইব্ন ইউসুফ যুরকানী মালিকী, ওফাত ১১২২ ঈসায়ি

দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত- লেবানন (প্রথম প্রকাশ) ১৯৯৬ ঈসায়ি।

২৭. **সুরুরুল মাহযূন**

ইমাম শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, ওফাত ১১৭৬ হিজরি

দারুল ইশাআত, উর্দুবাজার- করাচী, পাকিস্তান।

২৮. **ফুয়ূদুল হারামাইন (উর্দু)**

ইমাম শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, ওফাত ১১৭৬ হিজরি

দারুল ইশাআত, উর্দুবাজার, করাচী- পাকিস্তান ১৪১৪ হিজরি।

২৯. **তাফসীরে মাযহারী (উর্দু)**
আল্লামা কাযী ছানাউল্লাহ উসমানী পানিপথী, ওফাত ১২২৫ হিজরি
দারুল ইশাআত, উর্দুবাজার, করাচী- পাকিস্তান ১৯৯৯ ঈসায়ি।

৩০. **আনওয়ারুল মুহাম্মাদিয়্যা মিনাল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়্যা**
ইমাম কাযী ইউসুফ ইব্‌ন ইসমাঈল নাবহানী, ওফাত ১৩৫০ হিজরি
দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত- লেবানন (তৃতীয় প্রকাশ) ২০০৮ ঈসায়ি।

৩১. **হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন ফী মু'জিযাতি সায়্যিদিল মুরসালীন**
ইমাম কাযী ইউসুফ ইব্‌ন ইসমাঈল নাবহানী, ওফাত ১৩৫০ হিজরি
দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত- লেবানন (দ্বিতীয় প্রকাশ) ২০০৫ ঈসায়ি।

৩২. **আল আসমা ফীমা লিসায়্যিদিনা মুহাম্মাদ মিনাল আসমা**
ইমাম কাযী ইউসুফ ইব্‌ন ইসমাঈল নাবহানী, ওফাত ১৩৫০ হিজরি
শারিকাহ আবনাউ শারীফ আল আনসারী, বৈরুত- লেবানন।

৩৩. **আহসানুল ওয়াসাইল ফী নাযমি আসমায়িন নাবিয়্যিল কামিল**
ইমাম কাযী ইউসুফ ইব্‌ন ইসমাঈল নাবহানী, ওফাত ১৩৫০ হিজরি
শারিকাহ আবনাউ শারীফ আল আনসারী, বৈরুত- লেবানন।

৩৪. **তারজুমানুস সুন্নাহ**
আল্লামা বদরে আলম মিরাঠী, ওফাত ১৩৮৫ হিজরি
এইচ এম সাঈদ কোম্পানী, করাচী- পাকিস্তান।

৩৫. **সীরাতুল মুস্তাফা (উর্দু)**
আল্লামা ইদরীস কান্দালুবী, ওফাত ১৩৯৪ হিজরি
আল মাতবাআতুল আরাবিয়্যা, আনারকলী, লাহোর- পাকিস্তান- ১৯৮৫ ঈসায়ি।

৩৬. **যিক্‌রে মুবারক (উর্দু)**
শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়্যা কান্দালুবী, ওফাত ১৪০২ হিজরি
মাদরাসায়ে এহসানুল কুরআন, লাহোর- পাকিস্তান ১৪৩০ হিজরি।

৩৭. **মু‘জিযাতুর রাসূল**
শায়খ মুহাম্মাদ মুতাওয়াল্লী শা‘রাওয়ী, ওফাত ১৪১৯ হিজরি
দারুল কালাম, বৈরুত- লেবানন।

৩৮. **আসসীরাতুন নাবাবিয়্যা**
আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, ওফাত ১৪২০ হিজরি
দারুল কালাম, দামেশক- সিরিয়া (চতুর্থ প্রকাশ) ২০০৭ ঈসায়ি।

৩৯. **সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম**
ইমাম আবদুল্লাহ সিরাজুদ্দীন আল হুসাইনী, ওফাত ১৪২২ হিজরি
মাকতাবাহ দারুল ফালাহ, হালাব- সিরিয়া।

৪০. **যাখাইরুল মুহাম্মাদিয়্যা**
ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলাবী আল মালিকী আল মাক্কী, ওফাত ১৪২৫ হিজরি
মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত- লেবানন (প্রথম প্রকাশ) ২০০৬ ঈসায়ি।

৪১. **তারীখুল হাওয়াদিস ওয়া আহওয়ালুন নাবাবিয়্যাহ**
ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলাবী আল মালিকী আল মাক্কী, ওফাত ১৪২৫ হিজরি
(দ্বাদশ প্রকাশ) ১৯৯৬ ঈসায়ি।

৪২. **ওয়াহুয়া বিল উফুকিল আ‘লা**
ইমাম সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলাবী আল মালিকী আল মাক্কী, ওফাত ১৪২৫ হিজরি
মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত- লেবানন (প্রথম প্রকাশ) ২০০৮ ঈসায়ি।

৪৩. **আর রাহীকুল মাখতূম**

শায়খ সাফিউর রাহমান মুবারকপুরী, ওফাত ১৪২৭ হিজরি

দারুল ওয়াফা, মিসর (বিংশ প্রকাশ) ২০০৯ ঈসায়ি।

৪৪. **মুনতাখাবুস সিয়ার (উর্দু)**

শামসুল উলামা আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ, ওফাত ১৪২৯ হিজরি

ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম (দ্বিতীয় প্রকাশ) ১৯৮৪ ঈসায়ি।

৪৫. **হাযাল হাবীব ইয়া মুহিব্ব**

শায়খ আবু বাক্‌র জাবির আল জাযাইরী

দারুস সালাম, কায়রো- মিসর (দশম প্রকাশ) ২০০৮ ঈসায়ি।

৪৬. **কিতাবুন নুবুওয়াত ওয়াল আম্বিয়া**

শায়খ মুহাম্মাদ আলী সাবুনী, ওফাত ২০১৫ ঈসায়ি

মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত- লেবানন ২০০৫ ঈসায়ি।

৪৭. **আসমাউন নাবীয়্যি ফিল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ**

শায়খ ড. আতিফ কাসিম আমীন মালিজী

আ'লামুল ফিক্‌র লিততাবাআতি ওয়ান নাশ্‌র, কায়রো, মিসর (১ম প্রকাশ) ১৯৯৯ ঈসায়ি।

৪৮. **আসমায়ে মুস্তাফা (উর্দু)**

শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী

মিনহাজুল কুরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর, পাকিস্তান ২০০৩ ঈসায়ি।

৪৯. **সীরাতুর রাসূল (উর্দু)**

শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদিরী

মিনহাজুল কুরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর, পাকিস্তান।

৫০. **আসাহহুস সীয়ার (উর্দু)**
মাওলানা আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী
মাজলিসে নাশরিয়্যাতি ইসলাম, করাচী- পাকিস্তান।

৫১. **সীরাতে রাসূলে আরাবী (উর্দু)**
আল্লামা নূর বখশ তাওয়াক্কুলী
আলী কামরান পাবলিকেশন্স, লাহোর- পাকিস্তান ১৯৮৮ ঈসায়ি।

৫২. **রাহমাতুল লিল আলামীন**
আল্লামা কাযী সুলায়মান সালমান মনসুরপুরী, ওফাত ১৯৩২ ঈসায়ি
দারুল ইশাআত, করাচী- পাকিস্তান ২০০১ ঈসায়ি।

৫৩. **সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল উসওয়াতুল হাসানাহ**
শায়খ ড. আসআদ মুহাম্মাদ সাঈদ সাগিরজী, ওফাত ১৪৩৬ হিজরি
দারুল কালিমিত তায়্যিব, দামিশ্‌ক- সিরিয়া ২০০৩ ঈসায়ি।

৫৪. **আখবারু মাক্কাহ ফী কাদীমিদ দাহরি ওয়া হাদীসিহি**
ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক আল ফাকিহি, ওফাত ২৭৯ হিজরি
দার খিদর, বৈরুত - লেবানন ১৪১৪ হিজরি।

৫৫. **তারীখু মাআলিমিল মাদীনাতিল মুনাওয়ারা কাদীমান ওয়া হাদীসান**
শায়খ সায়্যিদ আহমাদ ইয়াসিন আল খায়্যারি, ওফাত ১৩৮০ হিজরি
মুআসসাসাতুল মাদীনা লিসসাহাফাহ (দারুল ইলম), জেদ্দা- সৌদিআরব।

গ্রন্থকারের হস্তলিপি

بسم الله الرحمن الرحيم

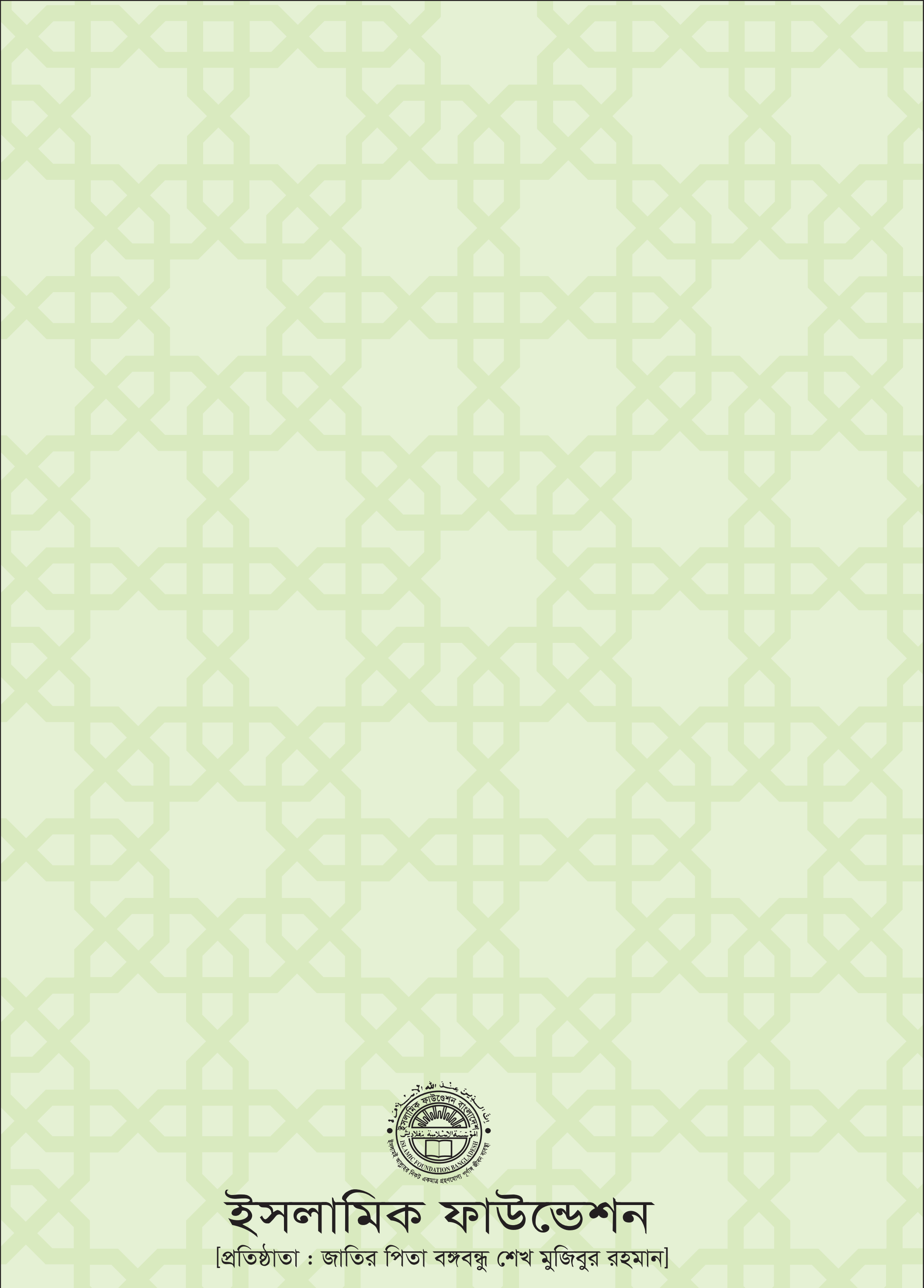
الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين،

وبعد — فان من اجلّ ما ينبغي معرفته وصرف العناية اليه هي السيرة الطيبة لهادي الخلق ورحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صنف في ذلك العلماء الكرام كتبا كثيرة متنوعة مفيدة، ولكن الهمم تقاصرت في هذا الزمان عن مطالعة الكتب المطولة فاردت جمع نبذ مختصر من سيرته الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم، وانا الآن في سفر بريطانية فساعدني في جمع المراجع والمصادر ولدي عبد الاول هلال الاستاذ بدار الحديث اللطيفية بلندن فجمعت مختصرا وسميته "تحفة الحبيب في نبذة من سيرة النبي الحبيب" صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ايام زيارتي للمدينة المنورة في شهر رمضان المبارك سنة الف واربعمائة واثنتين وثلاثين الهجرية قدمت هذا المختصر الى الشيخ العلامة السيد الحبيب عاصم علوي يحيى حفظه الله وبارك في خدماته الدينية، ولما سافر هو الى بريطانيه سنة الف واربعمائة وثلاث وثلاثين بدعوة من دار الحديث اللطيفيه بلندن شرفني بكتابة تقريظ على هذا ورغبني باشاعته جزاه الله خيرا وله مني الشكر الجزيل، واراد تي لو اذن لي الله الكريم بالحياة والتوفيق تحرير السيرة الطيبة ببعض التفصيل، واسأل الله تعالى قبول ذلك البضاعة المزجاة والنفع لنا ولسائر القارئين، وصلى الله على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله واصحابه ومحبيه اجمعين،

وانا الفقير الى الله الكريم
محمد حبيب الرحمن غفر له ولوالديه
٢٣-٥-٢٠١٢م

صورة خط المؤلف

ইফা–২০১৮-২০১৯–প্র/০৩২.০৩.০২৫–(উ)–৩২৫০



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]